সিদ্ধ যোগীর কর্ম্ম এই অর্থেই "যুক্ত" হইবে, অতএব সাধনার সময়ে এইরূপ যোগ অভ্যাস করিতে হইবে, সকল কর্ম্ম ভগবানে অর্পণ করিয়া নিষ্কাম-ভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে। গীতা অন্যত্র এই কথাই বলিয়াছে,

> যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
> যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্‌। ৯।২৭

"বিহার" শব্দের অর্থ কি? এই শব্দের দ্বারা ভ্রমণ, ব্যায়াম, আমোদজনক ক্রীড়া এই সব বুঝায়। জয়দেবের গীতগোবিন্দে আছে

> বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে।

অর্থাৎ সরস বসন্তে হরি এই সব স্থলে বিহার করেন। সন্ন্যাসীরা এ অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন না তাই তাঁহারা বিহার শব্দে ভ্রমণই বুঝিয়াছেন পাদভ্রমণ। কিন্তু যোগেশ্বর হরি যদি আমোদজনক ক্রীড়া করেন তবে যোগীরাই তাহা বর্জন করিবেন কেন? বস্তুত গীতা কোথাও সাধককে সন্ন্যাসীর কঠোরতা অবলম্বন করিতে বলে নাই—যোগের সাধক দেহ, প্রাণ মনকে সুস্থ ও প্রফুল্ল রাখিতে যথোচিত ব্যায়াম ক্রীড়া আদি করিবেন—ইহাই গীতার অর্থ বলিয়া মনে হয়। তবে মনে রাখিতে হইবে গীতা কোথাও নীচ পাশবিক ইন্দ্রিয়-ভোগের প্রশ্রয় দেয় নাই। অতএব "বিহার" শব্দে পরিমিত ইন্দ্রিয়ভোগ, স্ত্রীসম্ভোগ ইত্যাদি বুঝিলে ভুল করা হইবে—এ-কথাটি এখানে বলিতে হইল কারণ আধুনিক ব্যাখ্যাকারেরা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন।

যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।

যোগী কি কর্ম্ম করিবেন? কেহ কেহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, প্রণব অভ্যাস, উপনিষদ পাঠ এইরূপ কর্ম্মই যোগীর করণীয়। কিন্তু গীতা কোথাও কর্ম্ম শব্দ এইরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করে নাই। অষ্টাদশ অধ্যায়ে গীতাশিক্ষার সার সংগ্রহ করিয়া গীতা বলিয়াছে

> সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ,
> মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্‌।
> চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
> বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব। ১৮।৫৬-৫৭

গীতা এখানে "সর্ব্বকর্ম্মাণি" কথাটি উপর্য্যুপরি দুই বার ব্যবহার করিয়া দেখাইয়াছে যে, সংসারের প্রয়োজনীয় কোন কর্ম্মই যোগীর পক্ষে বর্জনীয় নহে এবং সকল কর্ম্মই যোগের সহিত করা যায় এবং তাহাই করিতে হইবে

এখন প্রশ্ন হইতেছে যোগী যদি আহার বিহার এবং সাংসারিক সকল কর্ম্ম সদা সর্ব্বদা করিতে থাকেন তাহা হইলে গীতা যে এই অধ্যায়েই বলিয়াছে সর্ব্বদা ধ্যানযোগ করিতে হইবে, যুঞ্জন্নেব সদাত্মানম্, তাহা কেমন করিয়া সম্ভব হয়? বস্তুতঃ এখানে কোন বিরোধই নাই—নিয়মিত ধ্যানযোগ অভ্যাস করার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার জন্যই গীতা বলিয়াছে সর্ব্বদা ইহা করিবে। ইহার অর্থ নহে যে, যে-ব্যক্তি ধ্যানযোগ অভ্যাস করিতেছে সে আর আহার বিহার বা অন্য কোন কর্ম্মই করিবে না, দিবারাত্রি শুধু ধ্যানে মগ্ন হইয়া থাকাই অভ্যাস করিবে। বস্তুতঃ এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা যাহাতে না হয় বিশেষ করিয়া সেই জন্য এইখানেই গীতা স্পষ্ট বলিল যে, ধ্যানযোগ সাধনার সময়েও সকল কর্ম্ম বর্জন করা যুক্তিযুক্ত নহে। তবে অবশ্য কোন্ কর্ম্ম কখন কি পরিমাণ করিলে তাহা যথাযথ হইবে তাহা অবস্থা বিবেচনা করিয়া নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। যোগসাধনার প্রথম অবস্থায় বিক্ষোভজনক অধিক কর্ম্মে ব্যাপৃত হওয়া চিত্তস্থৈর্য্যের হানিজনক। নিজেকে লইয়া ধীরে সুস্থে যে কর্ম্ম করা যায় তাহাই সাধকের পক্ষে উপযোগী। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, আজ কাল রাজনৈতিক কর্ম্ম যে-ভাবে চলিতেছে তাহার সহিত যোগসাধনা চলে না। অনেকেই উত্তেজনাময় রাজনৈতিক বা সমাজনৈতিক কর্ম্ম বা আন্দোলন করিতে করিতে মনে করেন তাঁহারা গীতার কর্ম্মযোগ করিতেছেন—সেটা ভ্রান্তি। তবে নিঃস্বার্থভাবে এইসব কর্ম্ম করিলে ক্রমশঃ গীতার কর্ম্মযোগের জন্য তৈয়ারী হওয়া যায়। আর যাঁহারা যোগে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের কোন কর্ম্মেই বাধা নাই—তাঁহারা সাধারণ কর্ম্মী অপেক্ষা অনেক বেশী কর্ম্ম অনেক অধিক শক্তির সহিত করিতে পারেন—কারণ তাঁহারা ভগবানের সহিত যুক্ত, ভগবানের শক্তি তাঁহাদের মধ্য দিয়া তাঁহাদের সকল কর্ম্ম করিয়া দেয়, যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ।

যুক্ত স্বপ্নাববোধস্য। নিদ্রায় ও জাগরণে যুক্ত হইতে হইবে। এখানে "যুক্ত" শব্দে পরিমিত অর্থ গ্রহণ করিলে পুনরুক্তি দোষ হয়, কারণ পূর্ব্ব শ্লোকেই ইহা বলা হইয়াছে। তাহা ছাড়া নিদ্রা পরিমিত হইলেই জাগরণও পরিমিত হইবে, জাগরণ পরিমিত হইলেই নিদ্রাও পরিমিত হইবে—এখানে শুধু এইটুকু বলিলেই চলিত যে, পরিমিত নিদ্রা আবশ্যক। অতএব এখানে যুক্ত শব্দের সাধারণ অর্থ, ভগবানের সহিত যোগ বুঝিলেই ভাল হয়।

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥১৮

অন্বয়। যদা বিনিযতং চিত্তম্ আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে, সর্ব্বকামেভ্যঃ নিঃস্পৃহঃ তদা যুক্তঃ ইতি উচ্যতে।

অনুবাদ। পূর্ণভাবে নিযন্ত্রিত চিত্ত সর্ব্বকামনা হইতে মুক্ত হইয়া যখন স্থিরভাবে আত্মায় প্রতিষ্ঠিত থাকে তখনই যোগসিদ্ধি হইয়াছে বলা যায়।

ব্যাখ্যা

যদা বিনিয়তং চিত্তম্। পাতঞ্জল দর্শনে চিত্তবৃত্তি-নিরোধকেই যোগ বলা হইয়াছে এবং ইহাই রাজযোগ বলিয়া পরিচিত। গীতা এখানে নিজের ভাবে রাজযোগের লক্ষণ কয়েকটি শ্লোকে দিয়াছে (১৮-২৩)—এই যোগ সিদ্ধ হইলেই গীতার মতে নির্ব্বাণের পরম শান্তি লাভ করা যায়। চিত্তকে সম্পূর্ণ ভাবে নিযন্ত্রিত করিতে হইবে। চিত্ত কি? ভারতের প্রাচীন যোগ সাধনা মনস্তত্ত্বের গভীর বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত—অতি পুরাকাল হইতে ভারতে এই সাধনা চলিয়া আসিতেছে। ধ্যানের দ্বারা যে উচ্চতম অধ্যাত্ম সত্য-সকল জ্ঞাত হওয়া যায় এবং সেই সব সত্য অনুসারে জীবনকে গঠিত ও চালিত করিলে সংসারের সকল দুঃখের ঐকান্তিক উপশম করিয়া পরম আনন্দ লাভ করা যায়—ইহা অনেক যোগী ঋষিই নিজেদের জীবনে প্রমাণিত করিযাছিলেন এবং তাঁহারা তাঁহাদের অভিজ্ঞতাসকলও লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তবে সকলের অভিজ্ঞতা ঠিক একই পথে চলে নাই এবং তাঁহাদের প্রকাশের ভাষাও এক নহে। এই জন্য দেখা যায় অধ্যাত্মশাস্ত্রে একই শব্দ অনেক সময়ে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। তাহা ছাড়া মানস ও অধ্যাত্ম তত্ত্বসকল জড় বস্তুর ন্যায় স্থূল নহে—তাহাদের বিশ্লেষণ ও বিভাগও কড়াকড়িভাবে করা যায় না—অতএব এক দর্শনশাস্ত্রের পরিভাষা লইয়া অন্য দর্শনশাস্ত্র বুঝিতে গেলে গোল-মাল হইতে পারে। অবশ্য মাঝে মাঝে এই সব বিভিন্ন পদ্ধতি ও মতবাদের সমন্বয়ের চেষ্টা হইয়াছে। এইরূপ সমন্বয়ের মধ্যে গীতার স্থান খুবই উচ্চে। রাজযোগের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করিয়া পতঞ্জলি একটি বিশিষ্ট সুসম্বদ্ধ প্রণালী দিয়াছেন। রাজযোগের সারতত্ত্বটুকু গীতা গ্রহণ করিয়াছে এবং নিজের ভাবে তাহা প্রকাশ করিয়াছে। উপনিষদে ধারাবাহিকভাবে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ কোথাও নাই—তবে মূল সূত্রগুলি সেখানে ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিশদভাবে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ পাওয়া যায় সাংখ্যদর্শনে—অন্যান্য দর্শন

অনেকাংশে ইহারই অনুসরণ করিয়াছে। তত্ত্বের দিক দিয়া সাংখ্যের সহিত পাতঞ্জলের কোন তফাৎই নাই—তাই পাতঞ্জল দর্শনকে সাংখ্যদর্শনেরই একটি শাখা বলিয়া কেহ কেহ গণ্য করিয়াছেন। উভয় দর্শনেরই মতে পুরুষ-প্রকৃতির ভেদজ্ঞানই সংসার হইতে মুক্তিলাভের উপায়। তবে এই জ্ঞান-লাভের উপায়স্বরূপ সাংখ্য তত্ত্ব-আলোচনা ও বিচারের উপর জোর দিয়াছে, এবং পাতঞ্জল মনকে নীরব ও শান্ত করিবার উপর জোর দিয়াছে এবং কেমন করিয়া ধাপে ধাপে সাধক চিত্তবৃত্তি-নিরোধের দিকে অগ্রসর হইতে পারে তাহা সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিয়াছে। সাংখ্যকারিকায় বলা হইয়াছে,

এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাস্মি ন মে নাহমিত্যপরিশেষম্।
অবিপর্য্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্ ॥৬৪

অর্থাৎ 'এই প্রকার পুনঃ পুন তত্ত্বের চিন্তনের দ্বারা বুদ্ধির বিপর্য্যয়ভাবের লোপ হয় এবং আমি দেহাদি নই আমার কেহ নাই এবং কর্ত্তা ভোক্তা বলিয়া আমি কেহ নহি, ইত্যাকার বিশুদ্ধ নির্ম্মল আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়।' এই যে বুদ্ধির বিচারের দ্বারা মননের দ্বারা জ্ঞান লাভ ইহা বেদান্তদর্শনেও স্বীকৃত—ইহাই প্রকৃত জ্ঞানযোগ এবং উপনিষদেই ইহার মূল রহিয়াছে। যথা ছান্দোগ্য উপনিষদে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে—যদা বৈ মনুতে—অথ বিজানাতি (৭।১৮-১) মত্বা বিজানন্ (৭।১৮।৪ ৭।২৫।২ ৭।২৬।১)। আবার অন্যত্র উপনিষদেই বলা হইয়াছে

যতো বাচো নির্বর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। তৈত্তিরীয় ৯।১

"মনের সহিত বাক্য যাহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আইসে। অন্যত্রও বলা হইয়াছে যে, তর্কের দ্বারা এই জ্ঞান লাভ করা যায় না। এই আপাতবিরোধের সমাধান এইরূপ মনে হয় যে, মন বুদ্ধির তর্কের দ্বারা যুক্তির দ্বারা সে জ্ঞান লাভ করা যায় না বটে তবে ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ ও মনন করিলে সেই অধ্যাত্ম-জ্ঞান লাভের সামর্থ্য জন্মে—তখন একাগ্র ধ্যানের দ্বারা মনকে নিশ্চল করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়। বস্তুতঃ আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ, মন বুদ্ধি তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, পরন্তু নিজেদের চঞ্চল ক্রিয়ার দ্বারা তাহাকে আড়াল করিয়া রাখে। মন স্থির শান্ত হইলে আত্মা অন্তর মধ্যে আপনিই প্রকাশিত হয়। এইরূপ ধ্যানের উপযোগিতা উপনিষদেও স্বীকৃত হইয়াছে—পাতঞ্জল দর্শন এই প্রণালীটির উপরেই জোর দিয়াছে এবং ইহাই রাজযোগ। এই যে জ্ঞানযোগ ও রাজযোগ—বস্তুতঃ ইহারা বিরোধী নহে—একের দ্বারা অপরের সহায়তা হয়, গীতা উভয় প্রণালীকেই নিজের সমন্বয়মূলক যোগের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে।

সাংখ্যকারিকা ও তত্ত্বসমাস সাংখ্যদর্শনের প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থ—এই দুইটি গ্রন্থে রাজযোগের কোন ইঙ্গিত নাই। তবে অপেক্ষাকৃত আধুনিক সাংখ্যপ্রবচনসূত্রে রাজযোগের উপযোগিতা স্বীকৃত হইয়াছে।

বৃত্তিনিরোধাৎ তৎসিদ্ধিঃ। ৩।৩১

তবে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে পাতঞ্জল দর্শন যোগের ব্যাখ্যায় চিত্তকেই প্রধান স্থান দিয়াছে—কিন্তু সাংখ্য কোথাও চিত্তের উল্লেখ করে নাই, চিত্ত সাংখ্যের চতুর্বিংশতিতত্ত্বের কোন একটি তত্ত্ব নহে। তবে চিত্ত কি? পাতঞ্জল দর্শনে চিত্ত বলিতে কোন বস্তু কোন তত্ত্ব উপলক্ষিত হইয়াছে? সাংখ্যকারিকায় চতুর্বিংশতি তত্ত্ব এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

প্রকৃতেমহাংস্ততোঽহঙ্কারস্তস্মাদগণশ্চ ষোড়শকঃ।
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চ ভূতানি।।২২

অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে মহৎ (বুদ্ধি) মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় (মন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়) ও পঞ্চতন্মাত্র (রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধ) এবং এই ষোড়শ পদার্থের মধ্যে পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত (ভূমি, জল, বায়ু অগ্নি আকাশ) উৎপন্ন। গীতা সাংখ্যের এই বর্ণনা গ্রহণ করিয়াছে তবে বলিয়াছে ইহা হইতেছে অপরা প্রকৃতির বর্ণনা। ইহা ছাড়াও ভগবানের এক স্বাম্ প্রকৃতিম্ নিজ পরা প্রকৃতি আছে, সাংখ্য দর্শনে তাহার কোনই সন্ধান নাই। পরা প্রকৃতির মর্ম্ম না বুঝিলে গীতার অর্থ বুঝা অসম্ভব—তবে এখানে সে প্রসঙ্গ আলোচনা করিবার আবশ্যকতা নাই। দৃশ্য জগতের যে বর্ণনা সাংখ্য দিয়াছে গীতা তাহা গ্রহণ করিয়াছে। উল্লিখিত তত্ত্বসকলের মধ্যে তিনটিকে অন্তঃকরণ বলা হয়—বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন। জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় পাচটি এই দশটিকে বাহ্য করণ বলে। বুদ্ধি মহৎতত্ত্বেরই নামান্তর এবং উহা অধ্যবসায়াত্মিকা অর্থাৎ নিশ্চয়জ্ঞানস্বরূপা। অবশ্য নির্ম্মল সাত্ত্বিক বুদ্ধিরই এই গুণ—তমঃ-প্রধান হইলে বুদ্ধি তদ্বিপরীত গুণময় হয়। শ্রীঅরবিন্দ সাংখ্যের বুদ্ধিকে বলিয়াছেন একাধারে intelligence and will—উহা সত্যাসত্য ভালমন্দ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করে— 'Buddhi, the discriminating principle, is at once intelligence and will, it is that power in Nature which discriminates and co-ordinates."

অভিমানোঽহঙ্কারঃ (২৪) আমি, আমার ইত্যাকার অভিমানবৃত্তিবিশিষ্ট বুদ্ধিকে অহঙ্কার বলে; তাহা হইতে দ্বিবিধ সৃষ্টি সমুৎপন্ন হয়, একদিকে একাদশ ইন্দ্রিয়, অপর দিকে পঞ্চ তন্মাত্র। বুদ্ধির এই অভিমানবৃত্তি দ্বারাই পুরুষ নিজেকে

প্রকৃতি ও তাহার কর্ম্মসমূহের সহিত এক করিয়া দেখে। উভয়াত্মকং মনঃ, মনঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয়রূপী সুতরাং মন হইতেছে মূল ইন্দ্রিয়, অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি ইহারই বিভিন্ন রূপ, গুণপরিণামবিশেষান্নানাত্বং বাহ্যভেদাশ্চ (সাংখ্যকারিকা ২৭)। মনই চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া বাহ্য বস্তুসকল প্রত্যক্ষ করে এবং হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া প্রতিক্রিয়া করে। এই যে বুদ্ধি অহঙ্কার ও মন—এই তিন লইয়া সাংখ্যের অন্তঃকরণ—ইহাদের কোন্‌টিকে পাতঞ্জল দর্শনে চিত্ত বলা হইয়াছে? অনেকেই বলেন অন্তঃকরণ এবং চিত্ত এক। কিন্তু পাতঞ্জল দর্শন কোথাও অন্তঃকরণ কথাটি ব্যবহার করে নাই, আর সাংখ্যদর্শনেও চিত্ত শব্দটি কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই—অতএব চিত্ত বলিতে পাতঞ্জল সাংখ্যের ঠিক কোন্ তত্ত্ব বা তত্ত্বগুলি বুঝিয়াছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। দার্শনিকগণ বুদ্ধি, চিত্ত মন প্রভৃতি শব্দগুলিকে অনেক সময়ে একই অর্থে ব্যবহার করিয়া গোলমালকে আরও বাড়াইয়া দিয়াছেন। চেতনার ব্যাপার সূক্ষ্ম জড়বস্তুর ন্যায় তাহার ক্রিয়া-সকলের কড়াকড়ি বিভাগ করা চলে না—তথাপি মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানের উপর যখন যোগসাধনা প্রতিষ্ঠিত তখন এ-সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব স্পষ্ট ও সঠিক ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়।

পাতঞ্জল দর্শনের কারবার প্রধানতঃ চিত্তবৃত্তি লইয়া এবং সেখানে বৃত্তি-সকলের যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে উহারা হইতেছে বিভিন্ন প্রকারের মানসিক জ্ঞান। পাতঞ্জলের মতে প্রথম চিত্তবৃত্তি হইতেছে প্রমাণ—অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ প্রমাণের দ্বারা আমাদের যে-সব জ্ঞান হয় সেইগুলিই বৃত্তি। প্রমাণের দ্বারা যথাযথ জ্ঞান হয় যথেষ্ট প্রমাণ না থাকিলে যে সব ভ্রান্ত বা অপূর্ণ জ্ঞান হয়—সে-সকলও বৃত্তি। বৃত্তিনিরোধ উপলক্ষে পাতঞ্জল পাঁচ-প্রকার বৃত্তির উল্লেখ করিয়াছে প্রমাণ বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। ভ্রমজ্ঞান, যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান—ইহাই বিপর্য্যয়। তমোগুণের দ্বারা আবৃত হইলে চিত্ত যে অবস্থা অবলম্বন করে তাহাকে নিদ্রা বলে। পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের পুনঃ প্রত্যক্ষ ব্যতীত তাহার জ্ঞানকে স্মৃতি বলে। বিষয়ের অস্তিত্ব না থাকিলেও কেবল শব্দদ্বারা যে এক প্রকার জ্ঞান হয় তাহাকে বিকল্প বলে, যেমন আকাশকুসুম। কিন্তু সাংখ্যদর্শনে বৃত্তি শব্দে শুধু জ্ঞানই বুঝায় নাই, কর্ম্মও বুঝাইয়াছে—জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বৃত্তি জ্ঞান, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বৃত্তি কর্ম্ম।

শব্দাদিষু পঞ্চানামালোচনমাত্রমিষ্যতে বৃত্তিঃ।
বচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দাশ্চ পঞ্চানাম্ ॥—সাংখ্যকারিকা ২৮

"শব্দাদি পঞ্চকে যথাক্রমে আলোচনা করা (অর্থাৎ গ্রহণ করা) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বৃত্তি। শব্দোচ্চারণ, গ্রহণ গমন মলত্যাগ এবং আনন্দ উপভোগ যথাক্রমে বাক্, পাণি, পদ, পায়ু এবং উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বৃত্তি।" আবার

স্বালক্ষণ্যং বৃত্তিস্ত্রয়স্য সৈষা ভবত্যসামান্যা।
সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃ পঞ্চ ॥ সাং কা (২৯)

অর্থাৎ বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মনঃ এই তিনটির আপন আপন স্বরূপগত বৃত্তি আছে, যথা বুদ্ধির অধ্যবসায়, অহঙ্কারের অভিমান এবং মনের সঙ্কল্প*। এই সকল বৃত্তি ইহাদিগের অসাধারণ অর্থাৎ নিজস্ববৃত্তি। সমস্ত করণসকলের সাধারণ অর্থাৎ মিলিতবৃত্তি প্রাণাদি পঞ্চবায়ু উৎপাদন করা।

অতএব দেখা যাইতেছে সাংখ্য ও পাতঞ্জল বৃত্তি শব্দ একই অর্থে ব্যবহার করে নাই। সাংখ্যের মতে জ্ঞান হইতেছে বুদ্ধির গুণ—বুদ্ধি মন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞান সংগ্রহ করে—অতএব পাতঞ্জল যে-সবকে চিত্তবৃত্তি বলিয়াছে সে-সব বস্তুতঃ বুদ্ধিরই বৃত্তি। কিন্তু শুধু জ্ঞানই বুদ্ধির কার্য্য নহে—ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য এই সবও বুদ্ধির কার্য। পাতঞ্জলের মতে প্রমাণাদি জ্ঞানবৃত্তিগুলিকে নিরুদ্ধ করিতে পারিলেই বুদ্ধির যে অবস্থা হইবে তাহাতেই পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদ অনুভূত হইবে এবং তাহা হইতেই মুক্তি ও কৈবল্য লাভ হইবে। বুদ্ধির যে অংশের কার্য্য বিশুদ্ধ জ্ঞানবৃত্তি—পাতঞ্জল সেইটিকেই চিত্ত বলিয়া অভিহিত করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সাংখ্যে এইরূপ বুদ্ধির বিশ্লেষণ করা হয় নাই—তাই চিত্ত একটি স্বতন্ত্র তত্ত্বরূপে গৃহীত বা উক্ত হয় নাই। শ্রীঅরবিন্দ সাংখ্যের বুদ্ধিকে বলিয়াছেন একাধারে intelligence এবং will, জ্ঞানমূলক এবং সঙ্কল্পমূলক। বুদ্ধির জ্ঞানমূলক অংশকেই পাতঞ্জল চিত্ত বলিয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আমরা এইরূপ তত্ত্ববিভাগেরই ইঙ্গিত পাই—সেখানে বলা হইয়াছে মন অপেক্ষা সঙ্কল্প (will) বড়, সঙ্কল্প অপেক্ষা চিত্ত বড়, চিত্ত অপেক্ষা ধ্যান বড়, ধ্যান অপেক্ষা বিজ্ঞান বড়। সঙ্কল্প (will) ও চিত্ত (intelligence) এই দুই লইয়া বুদ্ধি ইহা ধরিয়া লইলে সাংখ্য ও পাতঞ্জলের মধ্যে কোন ভেদ বা বিরোধ থাকে না এবং তাহা উপনিষদেরই অনুযায়ী হয়। উপনিষদও বলিতেছে ধ্যানের দ্বারা চিত্তকে একাগ্র করিলে তবেই বিজ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করা যায়।

---

* এই সঙ্কল্পের অর্থ কর্ম্মের will বা ইচ্ছা নহে—তাহা হইতেছে বুদ্ধির অধ্যবসায়ের অন্তর্গত। মনের বৃত্তি সঙ্কল্পের অর্থ সম্যকরূপে কল্পনা করা বিষয়ের image বা ছবি লওয়া।

জ্ঞান ও সঙ্কল্প—এই দুইটিকে আমরা বুদ্ধির ক্রিয়া বলিতেছি। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান মনের তিনটি ক্রিয়াবিভাগ করিয়াছে—thinking, feeling, willing. পাশ্চাত্য mind বা মন এবং সাংখ্যের বুদ্ধি একই পর্য্যায়ভুক্ত—সাংখ্যের যে মনঃ তাহা হইতেছে একটি ইন্দ্রিয় ইংরাজীতে তাহাকে sense-mind বলা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য মতে যাহা thinking এবং willing বুদ্ধির মধ্যে আমরা তাহা পাইতেছি—কিন্তু পাশ্চাত্য মতে যে feeling, সুখদুঃখবোধ, তাহার স্বতন্ত্র কোন উল্লেখ এই বিশ্লেষণে নাই। ইহার অর্থ নহে যে, ভারতীয় মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ সুখদুঃখকে কোন স্থান দেন নাই। বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়াদি সবই হইতেছে সত্ত্বাদি গুণত্রয়েরই পরিণতি—এই গুণত্রয়ের সহিত সুখ দুঃখ, মোহ অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত রহিয়াছে—তাই মন, বুদ্ধি, চিত্তের বিশ্লেষণে স্বতন্ত্রভাবে তাহাদের উল্লেখ করা হয় নাই। বস্তুতঃ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই সাংখ্য পাতঞ্জল প্রভৃতি সকল ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের লক্ষ্য। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই এই নিবৃত্তির উপায়—পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদজ্ঞানের দ্বারাই ইহা সাধিত হইতে পারে— সাংখ্য ও পাতঞ্জল আপন আপন ভাবে ইহারই প্রকৃষ্ট পন্থা দেখাইয়া দিয়াছে।

আমরা বলিয়াছি চিত্ত হইতেছে জ্ঞানবৃত্তির আধার—ইংরাজীতে যাহাকে বলা যাইতে পারে cognitive faculty বৌদ্ধ দার্শনিকগণও মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শনে চিত্ত, মন, বুদ্ধির প্রভেদ করা হয় নাই—পালি ভাষায় চিত্ত, মন, বিজ্ঞান এই সব শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু কালক্রমে মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বহুদূরই অগ্রসর হইয়াছিলেন আধুনিক পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান অনেকাংশেই বৌদ্ধগণের নিকট ঋণী। ধর্ম্মকীর্ত্তি তাঁহার ন্যায়বিন্দু গ্রন্থে লিখিয়াছেন,

সর্ব্ব চিত্তচৈত্তানাম্ আত্মসংবেদনম্

—নির্ব্বিশেষে চিত্ত ও চৈত্ত সকলেই হইতেছে স্বাভাস অর্থাৎ নিজেরাই নিজদিগকে জানে। এখানে চিত্ত শব্দে বুঝাইতেছে সকল প্রকার জ্ঞান (cognitions, thoughts, ideas) এবং চৈত্ত শব্দে বুঝাইতেছে সকল প্রকার সুখদুঃখের অনুভব। ইহারা স্বাভাস, সূর্য্যের ন্যায় স্বয়ং-প্রকাশ, self-concious, self-luminous. পাতঞ্জলদর্শনে এই বৌদ্ধমত খণ্ডন করা হইয়াছে,

ন তৎ স্বাভাসং দৃশ্যত্বাৎ--৪।১৯

—তাহারা প্রকৃতির অংশ, পুরুষের দৃশ্য—প্রকৃতি জড়, পুরুষের চৈতন্যে প্রতিফলিত হইয়া তাহারা চৈতন্যবৎ প্রতীত হয়। পাতঞ্জল এইভাবে বৌদ্ধমত

খণ্ডন করিয়াছে, ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে, এই পাতঞ্জলদর্শন বৌদ্ধ দর্শন প্রচারের পরে রচিত হইয়াছিল। যাহা হউক এখানে সে-প্রসঙ্গ আলোচনার প্রয়োজন নাই। এখানে আমাদের দ্রষ্টব্য চিত্ত বলিতে বৌদ্ধগণ কি বুঝিয়াছেন এবং এখানে ধর্ম্মকীর্তি চিত্ত এবং চৈত্ত এই প্রভেদ কেন করিলেন। ন্যায়বিন্দুর টীকায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে

চিত্তম্ অর্থমাত্রগ্রাহী চৈত্তা বিশেষাবস্থাগ্রাহিণঃ সুখাদয়ঃ সর্বে চ তে চিত্তচৈত্তাশ্চ...

সুখদুঃখবেদনায় কোন বাহ্য বিষয়ের গ্রহণ নাই উহারা শুধু আভ্যন্তরীণ অবস্থা, তাই চিত্তের সহিত প্রভেদ করিয়া তাহাদিগকে চৈত্ত বলা হইয়াছে। চিত্ত অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি মাত্রেই হইতেছে কোন বিষয়ের জ্ঞান। চিত্ত যখন যে বিষয় গ্রহণ করে তখনই তাহার আকার গ্রহণ করে—পাতঞ্জল দর্শনে ইহাকেই বিশেষ করিয়া চিত্তবৃত্তি বলা হইয়াছে এবং ইহার নিরোধ বা নিবৃত্তিকেই কৈবল্যলাভের উপায়স্বরূপ যোগসাধন বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। সাংখ্য ও পাতঞ্জলদর্শন সম্বন্ধে আধুনিক সিদ্ধান্ত গ্রন্থ কাপিলাশ্রমীয় পাতঞ্জল যোগদর্শন গ্রন্থেও এই কথাই বলা হইয়াছে— যোগশাস্ত্রের পরিভাষায় প্রত্যয় অর্থাৎ পরিদৃষ্ট চিত্তভাব বা বোধ-সকলকেই বৃত্তি বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রমাণ যথাভূত বোধ, বিপর্যয় অযথাভূত বোধ, বিকল্প প্রমাণবিপর্যয় ব্যতিরিক্ত অবস্তুবিষয়ক বোধ, নিদ্রা রুদ্ধাবস্থার অস্ফুটবোধ ও স্মৃতি বুদ্ধভাব সমূহের পুনর্বোধ ... যোগীরা চিত্ত নিরোধের জন্য জ্ঞানবৃত্তি-সকলের (cognitions) নিরোধ করিয়া থাকেন। জ্ঞাননিবৃত্তি করিয়া চিত্তনিরোধ করাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক উপায়। (পৃ ২৬)

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বুদ্ধির যে-অংশের কার্য্য বিষয়জ্ঞান পাতঞ্জল-দর্শনে তাহাই চিত্ত বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কপিলাশ্রমীয় যোগদর্শনেও বলা হইয়াছে "বাহ্যকরণার্পিত বিষয়যোগে (অর্থাৎ চক্ষু আদি ইন্দ্রিয় কর্তৃক গৃহীত রূপ আদি বিষয়ের দ্বারা) অন্তঃকরণের যে আভ্যন্তর পরিণামবৃত্তিসকল উৎপন্ন হয়, তাহাদের সমষ্টির নাম চিত্ত। বাহ্যকরণার্পিত বিষয়োপজীবী সেই চিত্ত, বাহ্যেন্দ্রিয়গণের পরিচালনকর্ত্তা বলিয়া তাহাদের প্রধান, যেমন প্রজাগণের রাজা প্রধান।" (পৃ ১২৪)। কিন্তু ইহাতেও বিষয়টি বেশ পরিষ্কার হয় না। পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাসভাষ্যে বলা হইয়াছে — 'প্রখ্যা-রূপং হি চিত্তসত্ত্বং' অর্থাৎ চিত্তরূপে পরিণত যে সত্ত্বগুণ তাহাই চিত্তসত্ত্ব অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞানবৃত্তি। কিন্তু তাহা রজ ও তম গুণের দ্বারা অনুবিদ্ধ হইয়া ত্রি-গুণাত্মক হয়, এবং তাহার ধর্ম্ম প্রখ্যা প্রবৃত্তি ও স্থিতি—চিত্তং হি প্রখ্যাপ্রবৃত্তি-

স্থিতিশীলত্বাৎ ত্রিগুণং। প্রখ্যা বলিতে জ্ঞান বুঝায়, বিষয়জ্ঞান, আর প্রবৃত্তি বলিতে বুঝায় ক্রিয়া। অতএব আমরা সাংখ্যমতে বুদ্ধির যে লক্ষণ বলিয়াছি intelligence এবং will, বোধ ও সঙ্কল্প, ভাষ্যকার ব্যাসের মতে তাহা চিত্তেরই ধর্ম্ম—অতএব বুদ্ধি ও চিত্ত একই, উভয়ে কোন প্রভেদ নাই। বস্তুতঃ এখানে ভাষ্যকার সাত্ত্বিক চিত্তের যে-সব লক্ষণ উল্লেখ করিয়াছেন জ্ঞান, ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, সাংখ্যকারিকা ঠিক এইগুলিকেই সাত্ত্বিক বুদ্ধির লক্ষণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। অতএব চিত্ত এবং বুদ্ধি একই হইল। তবে সাংখ্যদর্শন চিত্ত কথাটি কেন ব্যবহার করে নাই তাহার কারণ বোধ হয় এই যে ধাতুগত অর্থে চিত্ত শব্দে চৈতন্যই বুঝায়—সাংখ্যমতে একমাত্র পুরুষই চেতন, প্রকৃতি জড়, প্রকৃতির কোন তত্ত্বে চৈতন্যের লেশমাত্র নাই, বুদ্ধিও জড়, পুরুষের চৈতন্যে প্রতিফলিত হইয়া তাহাতে চৈতন্যের আভাস হয়। সেইজন্যই সাংখ্য বুদ্ধিকে চিত্ত বলে নাই—এমন কি বুদ্ধিতত্ত্বকেও মহৎ তত্ত্ব আখ্যা দিয়াছে। যাহা হউক এটুকু কেবল আমাদের অনুমান মাত্র। বুদ্ধিই মূল অন্তঃকরণ, অহংভাব এবং সঙ্কল্পক মন ঐ বুদ্ধিরই অন্তর্গত—সাংখ্যে এই তিনটিকে একত্র অন্তঃকরণ বলা হইয়াছে—আর জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় এই দশটিকে বাহ্যকরণ বলা হইয়াছে। এই দুই প্রকার করণের সাহায্যে পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সাধিত হয়। সাংখ্যকারিকায় বলা হইয়াছে "যেমন দ্বারের দ্বারা গৃহে প্রবেশ করিতে হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা বাহ্যরূপাদি অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইলে জ্ঞানোৎপন্ন হয় (৩৫)। যেহেতু বুদ্ধিই পুরুষের সর্ব্বপ্রকার ভোগ সাধন করায় এবং বুদ্ধিই পুনরায় প্রধান ও পুরুষের সূক্ষ্মভেদ জ্ঞাপন করিয়া অপবর্গের হেতু হয়, তন্নিমিত্ত অপর করণ-সকল বুদ্ধিতেই আপন বিষয়সকল অর্পণ করে" (৩৭)। ইন্দ্রিয়গণ যখন আর বিষয় গ্রহণ করিয়া বুদ্ধিকে বিষয়াকার করিবে না, তখন সেই বুদ্ধি পুরুষের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া অপবর্গের কারণ হইবে। যোগের ভাষায় ইহাই চিত্তবৃত্তিনিরোধ।

কিন্তু সাংখ্যের বুদ্ধি ও পাতঞ্জলের চিত্তকে এক করিয়া দেখিতে আর একটি আপত্তি আছে। উল্লিখিত ভাষ্যে বলা হইয়াছে, প্রখ্যা ও প্রবৃত্তির ন্যায় স্থিতিও চিত্তের স্বভাব অর্থাৎ চিত্তে যে-সব বৃত্তির উদয় হয় তাহাদের ছাপ থাকিয়া যায়, সেইগুলিকেই সংস্কার বলে। শুধু চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিলেই চলিবে না, চিত্ত হইতে এই সকল সংস্কারও দূর করিতে হইবে—তবেই চিত্ত সম্পূর্ণভাবে অব্যক্তে লীন হইবে। সে যাহাই হউক, সাংখ্য কিন্তু বুদ্ধিকে সংস্কারের আধার বলে নাই, মনকেই সেইরূপ আধার বলিয়াছে, তথাশেষ-সংস্কারাধারত্বাৎ (সাংখ্যপ্রবচন ২।৪২)। অসংখ্য যে সংস্কার আছে, যন্নিবন্ধন

ইন্দ্রিয়-সাহায্যে পুরুষ সাধারণতঃ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় মনই তৎসমস্তের আধার।'
অতএব দেখা যাইতেছে যে, সাংখ্যের বুদ্ধি ও মন—এই দুই লইয়া পাতঞ্জলের
চিত্ত। আমরা যে কোন বিষয় জানি কোন কর্ম্মের সঙ্কল্প করি সুখ দুঃখ
ভোগ করি সে-সবের সংস্কার আমাদের মধ্যে থাকিয়া যায় —এই সবই হইতেছে
আমাদের চিত্তের ক্রিয়া। ইংরাজীতে যাহাকে বলা যায় mental cons-
ciousness পাতঞ্জলের চিত্ত তাহাই এবং গীতা এই অর্থেই [illegible]
করিয়াছে বলিয়া মনে হয় তবে কোথাও কোথাও গীতা মনকে একটি ইন্দ্রিয়
হিসাবে চিত্ত হইতে পৃথক করিয়াছে যথা—

মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ। ৬।১৪।

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে গীতা যেখানে সাংখ্যের তত্ত্ববিশ্লেষণ অনু-
সরণ করিয়াছে সেখানে চিত্ত শব্দ ব্যবহার করে নাই সাংখ্যের তত্ত্ব হিসাবে
বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন এই তিনটি নামই ব্যবহার করিয়াছে (৭।৪ ১৩।৫)।
আর এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে গীতা রাজযোগের ব্যাখ্যা করিতে পুনঃ পুনঃ চিত্ত
শব্দটি ব্যবহার করিয়াছে। ইহাই গীতার সমন্বয়ের পদ্ধতি। গীতা বিভিন্ন
দর্শনের পরিভাষাকে মিলাইয়া দিয়াছে। গীতায় যোগের ঈশ্বর সাংখ্যের
পুরুষ বেদান্তের ব্রহ্ম শব্দ এক পুরুষোত্তমকে বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে—
কারণ—পুরুষোত্তম তত্ত্বের মধ্যে ঐ সকল তত্ত্বের সমন্বয় হইয়াছে। সেইভাবে
গীতা রাজযোগের চিত্ত কথাটি লইয়াছে এবং [illegible] বুদ্ধি বুঝাইতে
চিত্ত শব্দ ব্যবহার করিয়াছে (১০।৮ [illegible])। তবে গীতা চিত্তের
মধ্যে এমন একটি জিনিষ ধরিয়াছে যাহা রাজযোগে পরিস্ফুট হয় নাই—
তাহা হইতেছে হৃদয়ের ভক্তি ও প্রেম [illegible] সম্পূর্ণভাবে
ভগবানের সহিত এক হইতে হইলে বুদ্ধিযোগের সাহায্যে আমাদের সমগ্র
সত্তাকে ভগবানের দিকে ফিরাইতে হইবে—ইহাই গীতার [illegible] ইহা শুধুই
চিত্তবৃত্তিনিরোধ নহে, ইহা হইতেছে হৃদয় ও বুদ্ধিতে ও মনের সহিত
সর্ব্বদা এক হইয়া থাকা। 'সতত মচ্চিত্ত' বলিতে গীতা ইহাই বুঝাইয়াছে,

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।

বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥ ১৮।৫৭

ষষ্ঠ অধ্যায়ে গীতা এই পূর্ণযোগের ইঙ্গিত মাত্র করিয়াছে রাজযোগ অনুযায়ী
মন বুদ্ধিকে শান্ত ও একাগ্র করিবার উপরেই জোর দিয়াছে।

প্রসঙ্গক্রমে এইখানে আমরা প্রাচীন ভারতীয় মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু
বলিয়াছি—সে-সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা বলা যাইতে পারে। পাতঞ্জল দর্শনে
যাহাকে চিত্ত বলা হইয়াছে আমি চিন্তা করিতেছি আমি কর্ম্ম সঙ্কল্প

করিতেছি, আমি সুখদুঃখভোগ করিতেছি--এ-সব হইতেছে সেই চিত্তের বৃত্তি। ন্যায় দর্শন আত্মা বলিতে এই চিত্তকেই বুঝিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই দর্শনের মতে জ্ঞান কর্ম্ম, ইচ্ছা দ্বেষ সুখ দুঃখ এ-সব আত্মারই, এই সব হইতেই আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়—

ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নসুখদুঃখজ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গমিতি ১।১।১০

সাংখ্যে ও পাতঞ্জলের মতে এ-সব হইতেছে চিত্তের বৃত্তি, প্রকৃতির বিকার বা পরিণাম —এ-সব পুরুষকে স্পর্শ করে না, পুরুষ কেবল এ-সবের দ্রষ্টা মাত্র, বুদ্ধির ক্রিয়া অহঙ্কারের দ্বারা এ-সব পুরুষের বলিয়া ভ্রম হয়। গীতাও এ-সবকে ক্ষেত্র প্রকৃতিরই বিকার বলিয়াছে, ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ বা আত্মা এ-সব হইতে স্বতন্ত্র। আর ঐ যে ভ্রম, উহাও বস্তুতঃ পুরুষের নহে, উহা বুদ্ধিরই ভ্রম। বুদ্ধির ঐ ভ্রম দূর হইলে পুরুষ তাহার বৃত্তি-সকল দেখিয়াছে এই লজ্জায় সে যেন আত্মগোপন করে—ইহাকেই পুরুষের মুক্তি বলা হয়, পরন্তু পুরুষের বন্ধনও নাই মুক্তিও নাই। প্রকৃতপক্ষে ইহা বুদ্ধিরই মুক্তি—অর্থাৎ নিজ মূল অব্যক্তে বিলীন হওয়া। ইহাই সাংখ্য ও পাতঞ্জলের মত। গীতা ইহাদের অনুযায়ী পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদ স্বীকার করিলেও, চিত্ত বা বুদ্ধিকে অব্যক্তে লীন করাকেই নিজ যোগের লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করে নাই—অহঙ্কার হইতে মুক্ত হইলে বুদ্ধি লয়প্রাপ্ত হয় না পরন্তু তাহার রূপান্তর সাধিত হয়, তাহা পুরুষের চৈতন্যের সহিত সাধর্ম্ম্য লাভ করে। বেদান্তের ভাষায় জীব তখন ব্রহ্ম হয়। শঙ্করের গুরু গৌড়পাদ মাণ্ডুক্য উপ-নিষদের কারিকায় চিত্তের এইরূপ পরিণামের কথাই বলিয়াছেন—একদিকে চিত্তকে রাজযোগ অনুযায়ী লয় হইতে দিবে না, অন্যদিকে তাহাকে বিষয়-জ্ঞানে বিক্ষিপ্ত হইতে দিবে না—তাহাকে একাগ্র করিয়া আত্মায় বা ব্রহ্মে স্থাপন করিতে হইবে—তাহা হইলেই তাহা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইবে।

উপায়েন নিগৃহ্নীয়াদ্বিক্ষিপ্তং কামভোগয়োঃ।
সুপ্রসন্নং লয়ে চৈব যথা কামো লয়স্তথা ॥ ৪২
নাস্বাদয়েৎ সুখং তত্র নিঃসঙ্গ প্রজ্ঞয়া ভবেৎ।
নিশ্চলং নিশ্চরচ্চিত্তমেকীকুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥ ৪৫
যদা ন লীয়তে চিত্তং ন চ বিক্ষিপ্যতে পুনঃ।
অনিঙ্গনমনাভাসং নিষ্পন্নং ব্রহ্মতৎতদা ॥ ৪৬

—মাণ্ডুক্যকারিকা, অদ্বৈতপ্রকরণ।

অর্থাৎ "কাম্যবিষয়োপভোগে বিক্ষিপ্ত চিত্তকে যত্নপর্ব্বক নিগৃহীত করিবে। তেমনই লয় অবস্থাতে যে অত্যন্ত প্রসন্নতা পাওয়া যায় তাহা হইতেও চিত্তকে

সংযত করিবে, কারণ কাম যেমন অনর্থকারক লয়ও তেমনই। (চিত্তকে নিগৃহীত করিবে--ইহার অর্থ আত্মাতে নিরুদ্ধ করিবে)। সমাধিতে যে সুখ পাওয়া যায় তাহার আস্বাদন করিবে না, সে-সুখ মিথ্যা, অবিদ্যাকল্পিত—বুদ্ধির দ্বারা এইরূপ বিচার করিয়া তাহার প্রতি নিঃসঙ্গ বা নিঃস্পৃহ হইবে। আর যদি চিত্ত বাহিরের দিকে ধাবিত হইতে চায় তবে যত্নপূর্ব্বক তাহাকে নিশ্চল আত্মাতে একাগ্র করিবে। যে সময় চিত্ত লীন না হয় আবার বিষয়ভোগেও বিক্ষিপ্ত না হয় সে সময়ে তাহা ব্রহ্মই হইয়া যায়।'

ইহাই অদ্বৈত বেদান্ত মত। গীতা মূলত ইহা গ্রহণ করিয়াছে। সাংখ্য ও পাতঞ্জলের মতে চিত্ত হইতেছে প্রকৃতির অন্তর্গত বিকার এবং পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বেদান্তের মতে চিত্ত ব্রহ্মেরই চৈতন্য মায়ার প্রভাবে তাহাতে বিষয়-বিষয়ী ভাব দেখা দিয়াছে, জ্ঞান ও বৈরাগ্য অভ্যাসের দ্বারা এই দ্বৈতভাব দূর হইলেই বিষয়শূন্য চিত্ত ব্রহ্মই হইয়া যাইবে—তখন যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দলাভ হইবে তাহাই ব্রহ্মানন্দ,

স্বস্থং শান্তং সনির্ব্বাণমকথ্যং সুখমুত্তমম্ —মাঃ কাঃ ৩।৪৭

যোগবাশিষ্ঠেও চিত্তের স্বরূপ এইরূপই বর্ণনা করা হইয়াছে—সব চৈতন্যই মূলত এক চৈতন্য, ব্রহ্ম চৈতন্য মায়াপ্রসূত বিকার বা আবরণ দূর হইলে সকলেই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইবে। যোগবাশিষ্ঠের মতে ' চিত্ত, চেত্য (অর্থাৎ চিত্তের বিষয়) ও চেতনরূপ ত্রিপুটি ঐ মহাচিৎ (অর্থাৎ ব্রহ্ম বা পরমাত্মা) হইতে ভিন্ন বস্তু নহে, সেই মহাচিৎই মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি ও ইন্দ্রিয়াদিগোচর অর্থরূপে বিবর্ত্তিতা হন। মহাচিতের সেই অদ্বিতীয় জগদ্বিবর্ত্তকারিণী শক্তিহেতুই এই যে জগৎসত্তা বর্ত্তমান, তাহা মায়া ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।'' কিন্তু যোগবাশিষ্ঠ ও গৌড়পাদের উল্লিখিত মত অনুসরণ করিয়া শঙ্কর যে মায়াবাদমূলক অদ্বৈতের বিকাশ করিয়াছেন তাহা গীতার অদ্বৈত নহে। শঙ্করের মতে জগৎ বাস্তবিকই ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হয় নাই, ব্রহ্ম এই জগৎ হইয়াছেন বলিয়া যে মনে হয় সেটা ভ্রান্তি। গৌড়পাদও তাহার অদ্বৈতপ্রকরণ এই ভাবে শেষ করিয়াছেন,

এতত্তদুত্তমং সত্যং যত্র কিঞ্চিন্ন জায়তে। ৪৮

অর্থাৎ যে ব্রহ্ম হইতে কোন কিছুরই উৎপত্তি হয় না তাহাই সর্ব্বোত্তম সত্য। ব্রহ্মসূত্রে আমরা উপনিষদের যে অদ্বৈত মত পাই তাহা ইহার বিপরীত—জন্মাদ্যস্য যতঃ (১।১।২) অর্থাৎ এই অনন্ত বৈচিত্র্যময় বিশ্বের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় যাহা হইতে তিনিই ব্রহ্ম। অতএব জগৎ শুধু জীবের অজ্ঞান চৈতন্যেই আছে, ব্রহ্ম চৈতন্যে নাই—শঙ্করের এই মত উপনিষদ বা ব্রহ্মসূত্রের বিরোধী। যোগবাশিষ্ঠে আমরা এই মতের সূত্রপাত দেখিতে পাই,

চেত্যেন রহিতা যৈষা চিত্তদ্‌ব্রহ্ম সনাতনম্‌।
চেত্যেন সহিতা যৈষা চিৎসেয়ং কলনোচ্যতে ॥—৫।১৩।৫৩

যে চৈতন্যে কোন চেত্য বা বিষয় নাই তাহাই ব্রহ্ম, আর যে চৈতন্যে বিষয় আছে তাহাকেই চিত্ত বা মন বলা যায়। অতএব মনকে সকল প্রকার বিষয়চিন্তা-শূন্য করাই ব্রহ্ম হইবার উপায়।

যোগবাশিষ্ঠ চিত্ত ও মনে কোনও প্রভেদ করে নাই।

অনন্তস্যাত্মতত্ত্বস্য সর্ব্বশক্তের্মহাত্মনঃ।
সঙ্কল্পশক্তিরচিতং যদ্রূপং তন্মনোবিদুঃ। (৩।৯৬।৩)

অনন্ত সর্ব্বশক্তিমান পরমাত্মা নিজ সঙ্কল্পশক্তিতে মন রূপ গ্রহণ করিয়াছেন অর্থাৎ মন হইয়াছেন।

তত্ত্ববিষয়ে সাংখ্য পাতঞ্জলের দ্বৈতমতের সহিত এই অদ্বৈত মতের পার্থক্য থাকিলেও, কার্য্যতঃ এবং ফলত কোন তফাৎই নাই—কারণ উভয়মতেই জ্ঞান-লাভের সঙ্গে সঙ্গে জগৎ লুপ্ত হইয়া যাইবে, কারণ ব্রহ্মের বা পুরুষের কৈবল্যাত্মক শুদ্ধ চৈতন্যে বহুরূপাত্মক জগতের স্থান নাই। উভয় মতের মধ্যে প্রভেদ এই যে, সাংখ্য মতে জগৎ হইতেছে প্রকৃতির সৃষ্টি এবং প্রকৃতি পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র বস্তু শঙ্কর ও গৌড়পাদের মতে জগৎ কখনও সৃষ্টই হয় নাই, মায়া কেবল ভ্রম দেখায়। এই মায়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিলে অদ্বৈত মত ক্ষুণ্ণ হয়, আবার ইহাকে ব্রহ্মের শক্তি বলিলেও সৎ বস্তু বলিতে হয়—মায়া এই দুইটির কোনটিই নয়, তাহা যে কি তাহা বলা যায় না—অনির্ব্বচনীয়া। গীতা সাংখ্য মতানুযায়ী বলিয়াছে যে, জগৎ সত্য প্রকৃতিই এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে—তবে গীতার মতে প্রকৃতি স্বতন্ত্র বস্তু বা শক্তি নহে সে পুরুষোত্তমেরই শক্তি এবং তাঁহারই অধ্যক্ষতায় এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে,

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্‌।

শঙ্করের মতে ব্রহ্ম কিছুই করেন না মায়াই জগৎ ভ্রম সৃষ্টি করে। সাংখ্য মতে পুরুষ কিছুই করে না বসে তবে পুরুষ দেখে বলিয়াই প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করে—অতএব পুরুষ জগতের নিমিত্ত কারণ এবং প্রকৃতি উপাদান কারণ। গীতার মতে পুরুষোত্তম অকর্ত্তাও বটেন এবং কর্ত্তাও বটেন—তিনিই তাঁহার প্রকৃতিকে চালিত করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনিই সকলকে যন্ত্রবৎ চালিত করিতেছেন। অতএব জগৎ যে শুধু জীবের অজ্ঞান চৈতন্যেই রহিয়াছে তাহা নহে, ভগবানের চৈতন্যের মধ্যেও জগৎ রহিয়াছে—জগৎ শুধু আমাদেরই চিত্তের বিষয় নহে, ভগবানেরও চৈতন্যের বিষয়—তবে জগৎকে ভগবান যে-ভাবে দেখিতেছেন আমরা ঠিক সেইভাবে

দেখিতেছি না, কারণ আমাদের চৈতন্য নিম্নস্তরের, ইহা অহংভাবে সমাচ্ছন্ন, সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের অধীন, বাসনা, কামনা, বিক্ষোভের অধীন। গীতা আমাদের চৈতন্যের এই নিম্নতর ক্রিয়াকেই শান্ত ও রুদ্ধ করিতে বলিয়াছে, তাহা হইলে ভাগবত চৈতন্যের সহিত আমাদের চৈতন্য সাধর্ম্যলাভ করিবে, অজ্ঞান তিমির দূর হইয়া জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইবে—তখন জগৎ লুপ্ত হইবে না, পরন্তু সত্য আলোকে আমরা জগৎকে দেখিব, আমাদের কর্ম্ম ও জীবনও তখন লুপ্ত হইবে না—তাহা হইবে ভাগবত চৈতন্যের মধ্যে দিব্যকর্ম্ম ও দিব্য জীবন।

আত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে। সকল অধ্যাত্ম সাধনার প্রারম্ভই হইতেছে আমাদের বর্ত্তমান মানসিক চেতনা বা চিত্তকে শান্ত করা, একাগ্র করা, সাধারণত যে ভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে তাহাতে—আত্মা, অন্তঃকরণ এবং বাহ্যকরণ এই তিন লইয়া আমাদের সমগ্র সত্তা গঠিত। আমাদের যাহা মূল সত্তা, তাহাই আত্মা, তাহাকে জীব বলা হয়। বুদ্ধি, অহংকার, মন হইতেছে ঐ আত্মার আভ্যন্তরীণ করণ বা যন্ত্র। পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় এইগুলি হইতেছে বাহ্য করণ। দেহই হইতেছে এই সকলের আধার, আর দেহে যতক্ষণ প্রাণবায়ু সক্রিয় থাকে ততক্ষণই অন্তঃকরণ ও বাহ্যকরণের কার্য্য চলিতে থাকে। অন্তঃকরণত্রয়কেই যদি এক কথায় মন বলিয়া অভিহিত করা হয়—যেমন অনেকেই করিয়াছেন—তাহা হইলে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, দেহ, প্রাণ, মন ও আত্মা এই চারিটি লইয়াই আমাদের সমগ্র সত্তা। এই আত্মা কি তাহা লইয়া বিভিন্ন দর্শনে অনেক মতভেদ আছে। সাংখ্য মতে আমরা যাহাকে আত্মা বলি তাহা হইতেছে আমাদের বুদ্ধিতে পুরুষের প্রতিচ্ছায়ামাত্র, এই ছায়ারূপী আত্মাকে কেন্দ্র করিয়াই আমাদের দেহ, প্রাণ, মন দিয়া গঠিত ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে—ঐ ছায়ার শেষের সহিত এই ব্যক্তিত্বেরও শেষ হইবে, তাহাই মুক্তি, তাহাই কৈবল্য। বৌদ্ধমতে বুদ্ধির অতিরিক্ত কোন পুরুষ নাই—যেটাকে সাংখ্য বুদ্ধিতে পুরুষের ছায়া বলিতেছে সেটা বস্তুতঃ বুদ্ধিরই একটা সৃষ্টি—স্রোতের ন্যায় বুদ্ধি বা চিত্তের বৃত্তিসকল চলিতেছে, স্মৃতির দ্বারা ভ্রম হয় যে এ-সবের পিছনে এ-সবকে ধরিয়া একটা সৎপদার্থ বা কেন্দ্র রহিয়াছে—কিন্তু সেটা ভ্রম। যেমন বুদ্ধির অতিরিক্ত পুরুষ নাই তেমনই বুদ্ধির বাহিরে কোন জগৎও নাই—আছে শুধু বৃত্তিপরম্পরা বিজ্ঞান স্রোত—এই স্রোতকে বন্ধ করিলেই মুক্তি বা নির্ব্বাণ। ন্যায়দর্শনের মতে বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র কোন আত্মা নাই—বুদ্ধি, মন ইত্যাদি আত্মারই শক্তি। শঙ্করের মতে পুরুষ বা ব্রহ্মই আছে—বুদ্ধি ইত্যাদি হইতেছে মায়াকল্পিত ভ্রান্তি। এই সকল মতেরই বীজ উপনিষদের

মধ্যে আছে—এবং গীতার তিন পুরুষ এবং দুই প্রকৃতির পরিকল্পনায় এই সব মতেরই সমন্বয় হইয়াছে তাহা আমরা অন্যত্র ব্যাখ্যা করিয়াছি। গীতার মতে আমাদের যে বর্ত্তমান ব্যক্তিত্ব দেহ, প্রাণ, মন দিয়া গঠিত—ইহা হইতেছে অপরা প্রকৃতি। সাংখ্য কেবল এই প্রকৃতিকেই দেখিয়াছে, ইহার মধ্যে যে আত্মা তাহা আমাদের প্রকৃত আত্মা নহে তাহা প্রকৃত আত্মার প্রতিচ্ছায়া—ইহার উর্দ্ধে আমাদের প্রকৃত আত্মা রহিয়াছে, নিম্ন প্রকৃতির ক্রিয়াসকলকে শান্ত করিলে আমরা আমাদের অন্তরের মধ্যেই সেই প্রকৃত আত্মার সন্ধান পাইব, তখনই আমাদের অধ্যাত্মজীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেই জন্যই গীতা বলিয়াছে যে, বিক্ষিপ্ত চিত্তকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া যিনি আত্মায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তিনিই যুক্ত। যতক্ষণ আমরা বাসনা কামনার বশ ততক্ষণ এই প্রতিষ্ঠা দৃঢ়ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না—তাই সাধনা হইতেছে সকল বাসনা কামনাকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা এবং চিত্তকে আত্মায় একাগ্র করা।

সাংখ্যদর্শনে বলা হইয়াছে অন্তকরণং ত্রিবিধং দশধা বাহ্যম্ (সাং কা ৩৩)। বুদ্ধি অহঙ্কার ও মন এই তিনটিকে অন্তঃকরণ বলে। কিন্তু তত্ত্ববোধ নামক বিখ্যাত বৈদান্তিক গ্রন্থে যে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে অন্তঃকরণ চতুর্বিধ—মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্ত মনের ধর্ম্ম সঙ্কল্প বিকল্প অর্থাৎ চিন্তা ও সংশয় বুদ্ধির ধর্ম্ম নিশ্চিত নির্দ্ধারণ, চিত্তের ধর্ম্ম স্মৃতি এবং অহঙ্কারের ধর্ম্ম অভিমান। প্রবাদ আছে যে এই তত্ত্ববোধ গ্রন্থখানি শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক রচিত। কিন্তু মাণ্ডুক্যকারিকার ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন চিত্তং মন ইত্যনর্থান্তরম্ (৩।৪৪) অর্থাৎ চিত্ত এবং মন ভিন্ন পদার্থ নহে। আবার গীতার ভাষ্যে শঙ্কর চিত্তকে বলিয়াছেন অন্তঃকরণ। বস্তুতঃ শঙ্করের নামে যে সকল গ্রন্থ প্রচলিত আছে—সে-সবই প্রকৃতপক্ষে শঙ্করের রচিত কি না সে-বিষয়ে খুবই সন্দেহের স্থান আছে। বিশিষ্ট পণ্ডিতগণের মত এই যে শঙ্কর প্রস্থানত্রয়ের অর্থাৎ উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতা এই তিনটির ভাষ্য ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থই রচনা করেন নাই। যাহাই হউক আমরা চিত্ত প্রভৃতি লইয়া এতক্ষণ যে আলোচনা করিলাম তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে যদিও প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকেরা মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন—তাঁহারা একই জিনিষ বুঝাইতে সকল সময়ে একই শব্দ বা কথা ব্যবহার করেন নাই এবং সেজন্য তাঁহাদের বক্তব্য বুঝিতে আমাদিগকে অনেক সময় খুবই বেগ পাইতে হয়, এবং সকল সময়ে আমরা যে তাঁহাদের অর্থটি ঠিক মত ধরিতে পারিব তাহাও সম্ভব নহে। তবে এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে—ভারতীয় দার্শনিকেরা

যাহাকে অন্তঃকরণ বলিয়াছেন—সেটি হইতেছে বস্তুতঃ আমাদের বাহ্য চৈতন্য, আমরা সাধারণ জীবনে যে চিন্তা করি, সত্যাসত্য ভাল মন্দ বিচার করি, কর্ম্মের সঙ্কল্প করি, সুখদুঃখ বোধ করি, স্নেহ, প্রেম, দয়া, কাম, ক্রোধ, ভয়, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি আবেগের দ্বারা বিক্ষুব্ধ বা চালিত হই—এই সবের সমষ্টিকেই অন্তঃকরণ বা চিত্ত বা মন বলা হইয়াছে—পাশ্চাত্য ভাষায় ইহাই হইতেছে Mind বা Mental consciousness, মানস-চৈতন্য। কিন্তু শুধু এইগুলি লইয়াই আমাদের আভ্যন্তর জীবন গঠিত নহে—এইগুলি হইতেছে আমাদের আভ্যন্তর জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বাহিরের দিক, ইংরাজীতে যাহাকে বলা যাইতে পারে Surface consciousness. আর এই বাহ্য চৈতন্যের মধ্যে শুধু যে মনের চৈতন্যই আছে তাহা নহে। আমাদের সত্তার প্রত্যেক স্তরের, মনের, প্রাণের, দেহের এক একটা নিজস্ব চৈতন্য আছে। উপনিষদে বলা হইয়াছে যে, আমাদের মধ্যে পাঁচটি কোষ রহিয়াছে, অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়। এর প্রত্যেকটি হইতেছে ব্রহ্মেরই এক একটি রূপ, অন্ন ব্রহ্ম, প্রাণ ব্রহ্ম, মন ব্রহ্ম ইত্যাদি। ব্রহ্ম হইতেছেন চৈতন্যস্বরূপ—অতএব আমাদের এই অন্নময় স্থূল দেহ এবং প্রাণ মন ইত্যাদি লইয়া যে আমাদের সূক্ষ্মদেহ—এ-সবেরই নিজস্ব চৈতন্য আছে—তাহারা পরস্পর হইতে পৃথক তবে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত এবং পরস্পরের উপর ক্রিয়াশীল। কিন্তু আমাদের বাহ্যিক মন ও ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে সে-সব মিশিয়া গিয়া একই বলিয়া প্রতীত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আমাদের এই তথাকথিত জড়দেহটার একটা নিজস্ব চৈতন্য আছে এবং উহা সেই চৈতন্য হইতে কাজ করে, সেজন্য আমাদের মানসিক ইচ্ছার কোনও অপেক্ষা রাখে না, এমন কি সেই ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কাজ করে, আমাদের বাহ্যিক মন এই দেহ-চৈতন্য সম্বন্ধে খুব কমই জানে, নিতান্ত অসম্পূর্ণভাবে ইহাকে অনুভব করে, কেবল ইহার পরিণাম ফলগুলিই দেখিতে পায়, কিন্তু তাহাদের কারণ সন্ধান করা তাহার পক্ষে অতিশয় কঠিন হয়। এই পৃথক দেহ-চৈতন্য সম্বন্ধে সজ্ঞান হওয়া, ইহার বিভিন্ন ক্রিয়া এবং যে-সব শক্তি ভিতর ও বাহির হইতে ইহার উপর কাজ করিতেছে সে-সমুদয়কে দেখা ও অনুভব করা এবং ইহার অতি-প্রচ্ছন্ন এবং (আমাদের নিকট) অবচেতন প্রক্রিয়াগুলিকেও কেমন করিয়া সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে হয় তাহা শিক্ষা করা পূর্ণযোগের অন্তর্গত।

আমাদের সমস্ত সত্তা ব্যাপিয়া এবং ইহার সকল স্তরেই যেমন একটা বাহ্যিক চৈতন্য আছে, তেমনই একটা আভ্যন্তরীণ চৈতন্যও আছে। সাধারণ মানুষ তাহার বাহ্য সত্তাটির সহিতই পরিচিত, ইহার পিছনে যাহা

কিছু আছে সে-সব সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞান। অথচ বাহিরে যতটুকু রহিয়াছে, আমাদের যেটুকুকে আমরা জানি বা জানি বলিয়া মনে করি, এমন কি বিশ্বাস করি যে এইটুকুই আমাদের সবখানি, বাস্তবিক পক্ষে সেটি হইতেছে আমাদের সত্তার অতি ক্ষুদ্র অংশ, আমাদের খুব বেশী ভাগটাই রহিয়াছে বাহ্যস্তরের নীচে। আরও ঠিক হয় যদি বলা যায় যে, উহা রহিয়াছে সম্মুখভাগস্থ চৈতন্যের পশ্চাতে, পর্দার আড়ালে উহা গুহ্য এবং কেবল গুহ্যজ্ঞানের দ্বারাই উহাকে জানিতে পারা যায়। এই যে সত্য, ইহারই একটুখানি আধুনিক মনোবিজ্ঞান ও সাইকিক সায়েন্স্ দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে। জড়ানুগত মনোবিজ্ঞান এই প্রচ্ছন্ন অংশটিকে বলে অচেতন সত্তা, the Inconscient, যদিও সেই সঙ্গেই কার্য্যতঃ স্বীকার করে যে এই অংশটি বহিঃস্থ চেতন সত্তা অপেক্ষা অনেক বড, অনেক বেশী শক্তিমান ও গভীর,—ঠিক যেমন উপনিষদ আমাদের অতি-চেতন সত্তার নাম দিয়াছে সুষুপ্ত-আত্মা যদিও বলা হইয়াছে যে, এই সুষুপ্ত আত্মাই অনন্তগুণে বড বুদ্ধি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান প্রজ্ঞা, ঈশ্বর। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানশাস্ত্র (Psycho-Analysis) এই প্রচ্ছন্ন চৈতন্যের নাম দিয়াছে অধঃস্থ সত্তা the Subliminal self, এবং এখানেও স্বীকার করিয়াছে যে, উপরে যে ক্ষুদ্রতর সত্তা রহিয়াছে তাহা অপেক্ষা এই অধঃস্থ সত্তার আছে অধিক শক্তি অধিক জ্ঞান এবং গতি-বিধির অধিক অবাধ ক্ষেত্র। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই যাহা কিছু সব পশ্চাতে রহিয়াছে এই যে সমুদ্রের একটি তরঙ্গ বা তরঙ্গমালা হইতেছে আমাদের জাগ্রত চৈতন্য, ইহার বর্ণনা কোনও একটিমাত্র কথা দ্বারা হইতে পারে না, কারণ ইহা অতিশয় বিমিশ্র। ইহার কতক অংশ অবচেতন এবং আমাদের জাগ্রত চৈতন্য অপেক্ষা নিম্নস্তরে, সাংখ্য ও পাতঞ্জল এই অংশটিকেই বলিয়াছে বাসনা বা সংস্কারের আধার, পাশ্চাত্য ভাষায় ঠিক এই অংশটিকেই the Sub-conscient (অবচেতন) বলা চলে। আবার কতক অংশ আমাদের জাগ্রত চৈতন্যের সম-স্তরে (অর্থাৎ ঊর্দ্ধেও নহে, নিম্নেও নহে) কিন্তু পশ্চাৎভাগে রহিয়াছে এবং ইহা অপেক্ষা অনেক বড, আবার কতক অংশ আছে ঊর্দ্ধে, তাহা আমাদের চেতনার অতীত, অতি-চেতন, Super-conscient. আমরা যেটাকে আমাদের মন (mind) বলি, সাংখ্যের বুদ্ধি এবং পাতঞ্জলের চিত্ত যাহার অন্তর্গত, সেটা কেবল বাহিরের মন, বাহ্যিক মানসিক ক্রিয়া, পিছনে যে বৃহত্তর মন রহিয়াছে উহা তাহারই আংশিক প্রকাশের যন্ত্রস্বরূপ—সেই বৃহত্তর মনটি সাধারণতঃ আমাদের অজ্ঞাত, সেটিকে জানিতে হইলে আমাদিগকে অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। সেই রকমই আমাদের প্রাণসত্তা সম্বন্ধে আমরা যাহা জানি সেটা হইতেছে কেবল

বাহিরের প্রাণ বাহ্যিক প্রাণক্রিয়া তাহা এক বৃহত্তর গুহ্য প্রাণসত্তাকে আংশিকভাবে প্রকাশ করিতেছে, কেবল অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই আমরা সেই বৃহত্তর প্রাণসত্তাকে জানিতে পারি। সেইরূপই যেটাকে আমরা আমাদের ভৌতিক সত্তা (the physical being) বলি সেটি হইতেছে একটি বৃহত্তর ও সূক্ষ্মতর অদৃশ্য ভৌতিক চৈতন্যের কেবল বাহিরে দৃষ্ট প্রলম্বন মাত্র সেই বৃহত্তর ভৌতিক সত্তা অনেক অধিক শক্তিময় সজ্ঞান গ্রহণক্ষম নমনীয়, অব্যাহত।

আমরা উপরে আভ্যন্তরীণ চৈতন্য সম্বন্ধে যে-সব কথা বলিলাম সেগুলি শ্রীঅরবিন্দের একখানি পত্র হইতে গৃহীত। শ্রীঅরবিন্দের যোগের যে লক্ষ্য, আমাদের দেহ প্রাণ ও মনের, আমাদের আভ্যন্তরও বাহ্য জীবন ও কর্মের দিব্য রূপান্তর সাধন তাহার জন্য এই সব তত্ত্ব সম্বন্ধে সজ্ঞান হওয়া আবশ্যক এবং তাহারই জন্য বাহ্য মন ও প্রাণের ক্রিয়াকে শান্ত ও নীরব করিতে হয় অন্তর্মুখী হইতে হয়। এই পর্যন্ত প্রাচীন রাজযোগের সহিত শ্রীঅরবিন্দের অভিনব পূর্ণযোগের মিল আছে। কিন্তু রাজযোগের লক্ষ্য প্রকৃতির রূপান্তর সাধন করা নহে প্রকৃতির লয় সাধন করা। বাহিরের চৈতন্যকে শান্ত ও একাগ্র করিতে পারিলে আমাদের জ্ঞান ও শক্তি যে অনেক বাড়িয়া যায় পাতঞ্জল তাহা স্বীকার করিয়াছে এবং তাহাকেই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি নামে অভি-হিত করিয়াছে। কিন্তু পাতঞ্জলের মতে ইহাও বন্ধন বন্ধনের শেষ অবস্থা বা মুক্তির আরম্ভ। যখন সাধক এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতেও বৈরাগ্যযুক্ত হয় তখন যে সমাধি হয় তাহা সম্প্রজ্ঞাত হইতে ভিন্ন তাই তাহাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা হইয়াছে। তখন আর পুরুষের সম্মুখে প্রকৃতির কোন খেলা থাকে না জীবন থাকে না সংসার থাকে না—পুরুষের জানিবার, দেখিবার ভোগ করিবার তখন কিছুই নাই—পুরুষ তখনও চৈতন্যময় কারণ চৈতন্যই তাহার স্বরূপ—কিন্তু সে চৈতন্যের কোন বিষয়ই নাই—অথবা পুরুষ তখন শুধু নিজেই নিজেকে দেখিতেছে, জানিতেছে আস্বাদন করিতেছে—সে চৈতন্য উপলব্ধির বিষয়, ভাষায় তাহার স্বরূপ বর্ণনা করা যায় না। বস্তুত এরকম কোন চৈতন্য থাকিতে পারে কি না সে-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন—কিন্তু ইহা অনুভূতিলব্ধ সত্য। সেই চৈতন্য সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ নিজ অনুভূতি হইতে বলিয়াছেন—A silent and immobile consciousness infinitely spread out, not dependent on the personality but impersonal and universal not seeing and interpreting contacts but

motionlessly self-aware, not dependent on the reactions, but persistent in itself even when no reactions take place.

পাতঞ্জলের মতে এই শুদ্ধ কৈবল্যাত্মক চৈতন্যলাভ করাই মানবজীবনের পরম ও চরম লক্ষ্য, ইহার উর্দ্ধে আর কিছুই নাই, সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ। এই অবস্থায় সংসারের লোপ হয়, জীবনের লোপ হয়, সেই সঙ্গে জীবনের সকল দুঃখ যন্ত্রণার চিরনিবৃত্তি হয়।

কিন্তু গীতা এই মত গ্রহণ করে নাই। গীতার মতে পুরুষের ঐ নীরব নিশ্চল নির্ব্বিষয় চৈতন্যই তাহার সমগ্র সত্তা নহে, উহা কেবল তাহার সত্তার একটি দিক, অন্য দিকে ঐ নিশ্চল প্রতিষ্ঠা হইতেই অনন্তধারায় জগৎ উৎসারিত হইতেছে। প্রথমটি পুরুষের অক্ষর রূপ, দ্বিতীয়টি তাহার ক্ষররূপ, কিন্তু পরম পুরুষ এই দুয়েরই অতীত, তাহার মধ্যে একই সাথে এই দুইটি ভাবই রহিয়াছে, তাই গীতা তাহাকে পুরুষোত্তম নামে অভিহিত করিয়াছে। প্রথমে অক্ষর পুরুষের শান্ত চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে—তাহার জন্য রাজযোগের সাধনা সহায় স্বরূপ তারপর পুরুষোত্তমের পূর্ণ চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে তাহার জন্য সাধনা হইতেছে ভক্তিযোগ। তাই গীতা ষষ্ঠ অধ্যায়ে রাজযোগের বর্ণনা করিবার মাঝখানেই পুরুষোত্তমের প্রতি ভক্তির ইঙ্গিত করিয়াছে, মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ। আর এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে পুরুষোত্তমের প্রতি ভক্তিকেই যোগের চরম কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিয়াছে।

নিঃস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যঃ। আমরা উর্দ্ধতর জীবন লাভের জন্য যে চেষ্টাই করি না কেন তাহাতে প্রথমে স্বভাবতঃই কামনা আসিয়া পড়ে। কারণ আমাদের জ্ঞানদীপ্ত বুদ্ধি যাহা কিছু করিতে চায়, যে-কিছু মহা সিদ্ধি লাভ করিতে চায়, আমাদের হৃদয় যাহাকে একমাত্র আনন্দময় বস্তু বলিয়া আলিঙ্গন করিতে চায়, আমাদের মধ্যে যে অংশ নিজেকে সীমাবদ্ধ ও নির্জিত বলিয়া মনে করে এবং সীমাবদ্ধ বলিয়া অপ্রাপ্ত জিনিষসকলকে ধরিবার জন্য, আয়ত্ত করিবার জন্য তীব্রভাবে চেষ্টা করে তাহা সেই বস্তুর দিকে বিক্ষুব্ধ আবেগ ও কামনার সহিতই অগ্রসর হইবে। আমাদের মধ্যে এই যে লালসাময় প্রাণ-শক্তি বা কামকামী সত্তা রহিয়াছে, প্রথমে ইহাকে স্বীকার করিতে হইবে, তবে কেবল ইহাকে রূপান্তরিত করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই স্বীকার করিতে হইবে। প্রথম হইতেই ইহাকে শিখাইতে হইবে যেন অন্য সব কামনা পরিত্যাগ করিয়া সকল আবেগের সহিত কেবল ভগবানকেই কামনা

করে। এইটিই হল প্রধান জিনিষ, এইটি করিতে পারিলে তাহার পর তাহাকে শিখাইতে হইবে যেন ভগবানকে শুধু নিজের জন্য কামনা না করে, জগতের মধ্যে এবং আমাদের মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন তাঁহারই জন্য ভগবানকে কামনা করিতে হইবে। যেমন চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হইয়াছে,

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা কাম নাম ধরে।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা প্রেম বলি তারে॥

আমি খুব বড যোগী হইব, অনেক অধ্যাত্মসিদ্ধি লাভ করিব—এই সব কামনা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিতে হইবে, যদিও আমরা নিশ্চিত থাকিতে পারি যে সকল প্রকার অধ্যাত্মসিদ্ধিই আমরা শেষ পর্য্যন্ত লাভ করিব। তবে সে-সব সম্বন্ধে কোনরূপ কামনা পোষণ করা চলিবে না—আমাদিগকে কেবল দেখিতে হইবে আমাদের মধ্যে এবং জগতের মধ্যে ভগবানের কি মহান্ কার্য্য সিদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কঠিনতা হইতেছে কোন বস্তু আমাদের কামনা করা ঠিক তাহা লইয়া নহে পরন্তু কি ভাবে কামনা করিতে হইবে তাহা লইয়া। কারণ মানুষ যেরূপ অহংভাব লইয়া কামনা করে সে-ভাবে নহে, পরন্তু ভগবান যে-ভাবে কামনা করেন সেইভাবেই কামনা করিতে হইবে। আমি অহংভাবের বশে যেমনটি চাই, আমি যে লাভের স্বপ্ন দেখি, আমার যেটিকে ঠিক বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়—তাহার উপর জোর দেওয়া চলিবে না, আমাদিগকে শিখিতে হইবে যে এক মহত্তর ও উদারতর ইচ্ছা জগতে কাজ করিতেছে—সেই ইচ্ছাটি যাহাতে পূর্ণ হয় তাহার উপরই সব জোর দিতে হইবে—

"আমারে না যেন করিহে প্রচার
আমার আপন কাজে,
তোমারি ইচ্ছা করহে পূর্ণ
আমার জীবন মাঝে।"

এইভাবে শিক্ষিত হইলে কামনা আর আমাদের পরম বিক্ষোভের কারণ এর সর্ব্বপ্রকারে বিঘ্নস্বরূপ হইয়া থাকিবে না পরন্তু তাহা ভগবানের কামনারই স্বরূপ হইবে, গীতায় ভগবান যে বলিয়াছেন সর্ব্বভূতের মধ্যে আমিই কাম, আমাদের কামনা তখন সেই দিব্য কামনায় পরিণত হইবে। আত্মা যে কামনা করে তাহাতে আছে বিশুদ্ধ আনন্দ, তাহার মধ্যে কোনরূপ লালসা বা দুঃখের লেশ নাই—তাহা হইতেছে আমাদের মধ্যে ভগবানেরই দিব্য আনন্দ ভোগের ইচ্ছা।

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমাস্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥১৯

অন্বয়। যথা নিবাতস্থঃ দীপঃ ন ইঙ্গতে, আত্মনঃ যোগং যুঞ্জতঃ যতচিত্তস্য যোগিনঃ সা উপমা স্মৃতা।

অনুবাদ। বায়ুশূন্য স্থানে দীপশিখা যেমন চঞ্চল হয় না, আত্ম-যোগ-অভ্যাসকারী সংযতচিত্ত যোগীর অচঞ্চল চিত্তের উহাই দৃষ্টান্ত।

ব্যাখ্যা

গীতা যে এখানে রাজযোগেরই বর্ণনা দিতেছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। যোগসাধনা করিতে হইলে মনকে স্থির ও অচঞ্চল করিতে হইবে এবং ইহা আদৌ সহজ ব্যাপার নহে। রাজযোগের পদ্ধতি মনকে স্থির করিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী তাই গীতা ইহার বর্ণনা করিয়াছে। কিন্তু পাতঞ্জল যোগসূত্রে রাজযোগের যে বর্ণনা আছে তাহাতে যোগ দুইপ্রকার—সম্প্রজ্ঞাত এবং অসম্প্রজ্ঞাত। গীতা এখানে কোন যোগের বর্ণনা করিতেছে? পাতঞ্জল দর্শনে বলা হইয়াছে,

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।১।২

চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। বৃত্তিনিরোধ অর্থে এক অভীষ্ট বিষয়ে চিত্তকে স্থির রাখা অর্থাৎ অভ্যাস দ্বারা যথেচ্ছ যে-কোন বিষয়ে চিত্তকে স্থির রাখা। ইহাকেই সম্প্রজ্ঞাত যোগ বলে কারণ এইরূপ একাগ্রতার দ্বারাই সকল বিষয়ের প্রকৃষ্ট বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে জ্ঞান হয়। সম্প্রজ্ঞাত যোগে চিত্তের অবলম্বন-স্বরূপ একটি বিষয় থাকে—স্থূল বা সূক্ষ্ম কোন একটি বিষয় ধ্যান করিয়া তাহাতে সমাধি লাভ করা বা একান্তভাবে নিবিষ্ট হওয়াই সম্প্রজ্ঞাত যোগ বা সমাধি। চিত্ত এইরূপ সমাধিতে অভ্যস্ত হইলে পরে চিত্তকে একেবারে সকল বিষয়শূন্য করা যায়, সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ধ্যেয় বিষয়ের যে জ্ঞান থাকে তাহাও লুপ্ত হইয়া যায়—তখন যে অবস্থা হয় তাহাকেই বলা হয় অসম্প্রজ্ঞাত অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞানের অভাব। এইরূপ বৃত্তি-শূন্যতা অভ্যাস করিলে ক্রমশঃ চিত্ত একেবারে লয়প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ প্রকৃতিতে লীন হয়—ইহাই কৈবল্য, ইহাই সাংখ্য ও পাতঞ্জলের লক্ষ্য। কিন্তু গীতা এই লক্ষ্য গ্রহণ করে নাই, সাংখ্য ও পাতঞ্জলের দার্শনিক তত্ত্বও সম্যকভাবে গ্রহণ করে নাই। অতএব গীতার বর্ণনার মধ্যে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত যোগের প্রভেদ খুঁজিতে যাওয়া ঠিক হয় না। মনকে স্থির, শান্ত, একাগ্র করার জন্য রাজযোগের যতটুকু অভ্যাস প্রয়োজন গীতা তাহাই গ্রহণ করিয়াছে।

তবে গীতার ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে অনেকেই ধরিয়া লইয়াছেন যে, গীতা যে রাজযোগের বর্ণনা দিয়াছে তাহা সম্যকভাবে পাতঞ্জল যোগসূত্রেরই অনুযায়ী। মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন ১৮, ১৯ শ্লোকে গীতা যে বর্ণনা দিয়াছে তাহা অসম্প্রজ্ঞাত যোগ। আর পূর্ব্বে ১৫ শ্লোকে যে যোগের বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাই সম্প্রজ্ঞাত যোগ। আমরা কিন্তু গীতার এই শ্লোকগুলিতে একই যোগের বর্ণনা দেখিতে পাই, ইহাদের মধ্যে কোনই প্রভেদ নাই। ১৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে, 'এইভাবে সর্ব্বদা যোগ অভ্যাস করিলে যোগী নির্ব্বাণের পরম শান্তি লাভ করেন। এই শান্তিলাভই গীতার মতে রাজ-যোগসাধনার লক্ষ্য—অতএব ইহাই রাজযোগের চরম অবস্থা। কিন্তু পাতঞ্জল দর্শনে অসম্প্রজ্ঞাত যোগই চরম—সম্প্রজ্ঞাত যোগ কেবল তাহার পূর্ব্বাবস্থা। ১৮ শ্লোকে বলা হইয়াছে—নিঃস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যঃ। মধুসূদন সরস্বতী ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"যে ব্যক্তি সমস্ত কামনাতেই নিঃস্পৃহ, দৃষ্টবিষয়ক (ইহলৌকিক) অথবা অদৃষ্টবিষয়ক (পারলৌকিক) কামনাকলাপ হইতে যাহার স্পৃহা অর্থাৎ তৃষ্ণা নির্গত হইয়াছে এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'নিস্পৃহ' এই শব্দটির দ্বারা এখানে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির অন্তরঙ্গ সাধনস্বরূপ যে পরবৈরাগ্য তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।" পাতঞ্জল দর্শনে বলা হইয়াছে চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যে যোগ তাহা অভ্যাস ও বৈরাগ্য এই দুইটি উপায়ের দ্বারা লব্ধ হয়। আমরা পরে দেখিব গীতাও অভ্যাস ও বৈরাগ্যকে মনস্থির করিবার উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে (৬।৩৫)। পাতঞ্জল দ্বিবিধ বৈরাগ্যের কথা বলিয়াছে—বশীকার বৈরাগ্য এবং পরবৈরাগ্য।

দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়-বিতৃষ্ণস্য বশীকার-সংজ্ঞা বৈরাগ্যম্। —১।১৫

স্ত্রী, অন্ন, পান, ঐশ্বর্য্য এই সকল দৃষ্টবিষয়ে এবং স্বর্গসুখ প্রভৃতি শ্রুত বিষয়ে বিতৃষ্ণাই বশীকার সংজ্ঞক বৈরাগ্য। যোগীগণ এইরূপ ঐহিক ও পারত্রিক ভোগ্য বিষয়সকলের দোষ দর্শন করিয়া সে-সবে বিরক্ত হইয়া পুরুষের দর্শন অভ্যাস করিলে অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতি হইতে পৃথক এই তত্ত্বজ্ঞান অভ্যাস করিলে তাহাদের আর প্রকৃতি ও তৎকার্য জড়বর্গ বিষয়ে অনুরাগ থাকে না, ইহাকে পরবৈরাগ্য বলে। বশীকার বৈরাগ্য অভ্যাসের দ্বারা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়, তাহার পর পরবৈরাগ্যের দ্বারা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইয়া চিত্তের সম্পূর্ণ লয়। গীতা নিঃস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যঃ বলিতে বশীকারসংজ্ঞক বৈরাগ্যই বুঝিয়াছে, পরবৈরাগ্য নহে। মধুসূদন সরস্বতী নিজেই ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "দৃষ্টবিষয়ক অথবা অদৃষ্টবিষয়ক কামনা-কলাপ হইতে যাহার স্পৃহা অর্থাৎ তৃষ্ণা নির্গত হইয়াছে।" কিন্তু আমরা দেখিয়াছি

পাতঞ্জলের মতে ইহা হইতেছে বশীকারসংজ্ঞক বৈরাগ্যের বর্ণনা। আমাদের বক্তব্য এই যে, পরবৈরাগ্য এবং তাহার ফল অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি এখানে গীতার লক্ষ্য নহে। অবশ্য গীতা অন্যত্র পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদজ্ঞান লাভ করিতে বলিয়াছে, এবং গুণসকলের ঊর্দ্ধে উঠিতে বলিয়াছে নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন। এবং ইহা পাতঞ্জল মতানুযায়ী পরবৈরাগ্যেরই অনুরূপ

তৎ পরং পুরুষখ্যাতেঃ গুণবৈতৃষ্ণ্যম্ ॥ ১।১৬

কিন্তু পাতঞ্জলের মতে যোগী পরবৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তের লয় সাধন করিয়া সংসারের লোপ সাধন করিবেন—ইহা গীতার লক্ষ্য নহে। গুণাতীত হইয়া ঊর্দ্ধের এক অধ্যাত্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সংসারের সকল বস্তুকে দিব্যভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, সকল কর্ম্ম করিতে হইবে—ইহাই গীতার শিক্ষা। অতএব, পাতঞ্জল যোগদর্শনের সহিত গীতার কতক অংশে মিল থাকিলেও সর্ব্বতোভাবে মিল নাই—একথাটি অতি স্পষ্টভাবেই অবধারণ করা কর্ত্তব্য।

গীতা যে এখানে চিত্তলয়কারী কৈবল্য-সাধক অসম্প্রজ্ঞাত যোগের কথা বলিতেছে না, অন্য দিক হইতেও তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত যোগে মূল প্রভেদ এই যে, প্রথমটিতে স্থূল বা সূক্ষ্ম কোন একটি বিষয়ে চিত্তকে একাগ্র করিয়া সমাধিলাভ করিতে হয়—অর্থাৎ ঐ বিষয়ের সহিত একাত্মতা লাভ করিতে হয়, তাহার সহিত এক হইয়া যাইতে হয়। অসম্প্রজ্ঞাত যোগে এইরূপ বিষয়ের অভাব—তাহা হইতেছে চিত্তকে একেবারে বিষয়শূন্য করা—তাহাতে চিত্তের কোন বৃত্তি বা প্রত্যয় বা জ্ঞান থাকে না, তাহাই হইতেছে চিত্তের সম্যক নিরোধ। তাই সম্প্রজ্ঞাতকে বলা হয় সবীজ সমাধি অসম্প্রজ্ঞাতকে বলা হয় নির্ব্বীজ সমাধি। গীতা যে রাজযোগ সাধনার কথা বলিয়াছে তাহাতে সর্ব্বত্রই স্থূল বা সূক্ষ্ম বিষয়কে অবলম্বন করিতে বলা হইয়াছে—অতএব পাতঞ্জলের ভাষায় গীতার যোগ হইতেছে সম্প্রজ্ঞাত যোগ, অসম্প্রজ্ঞাত নহে। ইহা বিশেষ দ্রষ্টব্য যে, শঙ্কর, নীলকণ্ঠ, শ্রীধর প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ কেহই গীতার যোগকে অসম্প্রজ্ঞাত বলেন নাই। তাঁহারা সম্প্রজ্ঞাত কথাটিও ব্যবহার করেন নাই বটে, তবে ইহার ইঙ্গিত দিয়াছেন। ১৮ শ্লোকে যদা বিনিয়তং চিত্তং ' ব্যাখ্যা করিতে মধুসূদন বলিয়াছেন—"এইরূপে একাগ্রভূমিতে যে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয় তাহার কথা বলিয়া এই বারে নিরোধভূমিতে যে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয় তাহাই বলিবার উপক্রম করিতেছেন—যদা—যে সময়ে পরবৈরাগ্যবশতঃ বিনিয়তং—বিশেষরূপে নিয়ত (সংযত) অর্থাৎ সর্ব্ববৃত্তিশূন্য অবস্থায় স্থাপিত"। কিন্তু শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন,

বিশেষেণ নিযতং সংযতমেকাগ্রতামাপন্নং চিত্তং।' একাগ্রতাপন্ন চিত্তই সম্প্রজ্ঞাত সমাধিব অবস্থা।

গীতাব যোগ সালম্বন—সকল সময়েই তাহাতে ভগবানেব সহিত যোগ সাধনা কবিতে হয—চিত্তকে ভগবানেব দিকে একাগ্র কবা অভ্যাস কবিতে হয, মনঃ সংযম্য মচ্চিত্ত যুক্ত আসীত মৎপব—এখানে চিত্তকে প্রকৃতিতে লীন কবিবাব কোন কথাই নাই চিত্তেব লয নহে চিত্তকে ভগবদ্মুখী কবাই গীতাব যোগ। পাতঞ্জল যোগে যে-কোন বস্তুকে অবলম্বন কবিযা চিত্ত-নিবোধ অভ্যাস কবা যাইতে পাবে—গীতায একাগ্রতাব বিষয একমাত্র ভগবান,

মষ্যেব মনঃ আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয

বাজযোগে প্রথমে স্থূল বিষযে একাগ্রতা অভ্যাস কবিযা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতব তত্ত্বে যাইতে হয—গীতায এক ভগবানকে ধবিযাই চিত্তসংযম অভ্যাস কবিতে হয—কাবণ ভগবান স্থূল সূক্ষ্ম সবই, অণোবণীযান্ মহতো মহীযান্। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন মচ্চিত্তঃ' হও আমাতে চিত্তকে একাগ্র কব। এখানে "আমি" বলিতে অর্জুনেব বথে সাবথিরূপে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইতেছে, আবাব বিশ্বময ও বিশ্বাতীত পবমেশ্বব পবম ব্রহ্মকেও বুঝাইতেছে—কাবণ যিনি ব্রহ্ম, ঈশ্বব, তিনিই আবাব মানবদেহধাবী কৃষ্ণ। অর্জুন তাহাব সখা সাবথি গুরু, শ্রীকৃষ্ণেব মানবীয রূপে চিত্তকে একাগ্র কবিলেই তাঁহাব যোগাভ্যাস কবা হইবে—এবং ক্রমশঃ তিনি সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতব তত্ত্বে উপনীত হইতে পাবিবেন। গীতায ভগবান একদিকে তাঁহাব মানবীয রূপে চিত্তনিবেশ কবিতে বলিযাছেন, আবাব আত্মাতেও চিত্তনিবেশ কবিতে বলিযাছেন—প্রথমটি স্থূলবিষযক, দ্বিতীযটি সূক্ষ্মবিষযক—এবং দুইই হইতেছে পাতঞ্জলেব ভাষায সম্প্রজ্ঞাতযোগ।

বাজযোগ অনুযাযী যোগসমাধিব দৃষ্টান্তস্বরূপ গীতা বাযুশূন্য স্থানে দীপ-শিখাব তুলনা কবিযাছে। আমবা আমাদেব চৈতন্য ক্রিযাব দিকে লক্ষ্য কবিলেই এই দৃষ্টান্তেব সার্থকতা উপলব্ধি কবি। অর্জুন যেমন পবে বলিযাছেন, মানুষেব মন অতিশয় চঞ্চল—কোন এক বিষযে মনকে বেশীক্ষণ স্থিব বাখা অতিশয কঠিন—মন বিষয় হইতে বিষযান্তবে, চিন্তা হইতে অন্য চিন্তায অনবৰত ছুটিযা চলিযাছে—বাতাসে আন্দোলিত দীপশিখা এইরূপ মনেব প্রবৃত্তি দৃষ্টান্ত—উহা সর্ব্বদা এদিক ওদিক কবিতেছে। মন এইরূপ চঞ্চল হয তাহাব কাবণ উহা অতিশয বহির্মুখী, বাহ্যবিষয়েব বশ—বাহিব হইতে যে কোন স্পর্শ বা আঘাত আসিতেছে তাহাতেই বিচলিত হইতেছে ঠিক যেমন দীপশিখা বাযুতবঙ্গ লাগিযা বিচলিত হয। কিন্তু অভ্যাসেব দ্বাবা মনকে একাগ্র কবা যায়—তখন বাহিবেব কোন বিষযই মনকে স্পর্শ করিতে বা বিচলিত কবিতে পাবে না—এইরূপ একাগ্রতা যাঁহাদেব

স্থায়ীভাবে অভ্যস্ত হইযাছে তাঁহাবাই যোগী। যে কোন বিষযে মানুষ বস পায তাহাতেই চিত্ত একাগ্র হয—এবং এইভাবেই মানুষ ক্রমশঃ যোগ বা চিত্তস্থৈর্য্যের জন্য প্রস্তুত হইযা উঠে।* সাধাবণ জীবনে একাগ্রতাব একটি দৃষ্টান্ত দাবা খেলা। কোন কোন লোক ইহাতে এমন একাগ্র হয যে বাহ্য কোনদিকে আব তাহাদেব দৃষ্টি বা মন যায না। একটি গল্প আছে, একজন লোক নিবিষ্ট মনে দাবা খেলিতেছিল, এমন সময তাহাব এক আত্মীয আসিয়া সংবাদ দিল যে তাহাব ছেলেকে সাপে কামড়াইয়াছে। তাহাব মন এমনই একাগ্র যে সহসা ঐ কথাব অর্থই সে গ্রহণ কবিতে পাবিল না—শুধু জিজ্ঞাসা কবিল, "কাদেব সাপ?"

কখনও কখনও কোন অভিলষিত বিষযে সকল লোকেবই মন একাগ্র হয়—কিন্তু তাহাকেই যোগ-সমাধি বলা যায না। পাতঞ্জল ভাষ্যকাব চিত্তেব পাঁচটি অবস্থাব কথা বলিযাছেন—ক্ষিপ্ত মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিকদ্ধ। যে চিত্ত স্বভাবতঃ অত্যন্ত অস্থিব তাহাই ক্ষিপ্ত। তমোগুণেব আধিক্যে যে চিত্ত নিদ্রা, আলস্য জড়তাব অধীন তাহাই মূঢ়। প্রাযশঃই চঞ্চল থাকিযা কদাচিৎ স্থিবভাব অবলম্বন কবে একপ চিত্ত বিক্ষিপ্ত। অধিকাংশ সাধকেব চিত্ত বিক্ষিপ্তভূমিক। ববীন্দ্রনাথেব গানে এই অবস্থাবই পবিচয পাওযা যায—

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই
চিবদিন কেন পাই না?
কেন মেঘ আসে হৃদয আকাশে
তোমাবে দেখিতে দেয না?

আব একাগ্রতা যে-চিত্তেব স্বভাব হইযা দাঁড়াইযাছে তাহাবই একাগ্র ভূমি। গীতা চিত্তেব এই অবস্থা লাভ কবিবাব জন্যই সাধনা কবিতে বলিযাছে, মচ্চিত্তো সততং ভব। চিত্তেব এই অবস্থায যে সমাধি হয—তাহাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, ইহাব দ্বাবা জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তির সম্যক বিকাশ হয সাধক ইচ্ছামত সকল বিষয়েবই সত্য জ্ঞান লাভ কবিতে পাবেন। আব যখন চিত্তেব সমস্ত বৃত্তি সমস্ত ক্রিযা কদ্ধ হইয়াছে, সংস্কাবমাত্র অবশিষ্ট আছে—সেই অবস্থাকেই নিবোধভূমি বলা হয—নিবোধভূমিদ্বাবা চিত্ত বিলীন হইলে কৈবল্য হয। গীতা এই নিবোধভূমি বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিব কথা বলে নাই।

অনেকেই বলিযা থাকেন যে, হিন্দুদেব মধ্যে যে সন্ধ্যা, আবাধনা প্রতিমা-পূজা প্রচলিত আছে, তাহাই যোগসাধনা—কাবণ অষ্টাঙ্গযোগেব সকল প্রণালীই

* যথাভিমতধ্যানাদ্বা—পাতঞ্জল দর্শন ১।৩৯

উহাদের মধ্যে নিহিত আছে। পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাখ্যাকর্ত্তা বেদান্তচঞ্চু শ্রীপূর্ণচন্দ্র শর্ম্মা লিখিয়াছেন— হিন্দুশাস্ত্রে সচরাচর সন্ধ্যা, পূজা, উপাসনা ও স্তোত্রপাঠ প্রভৃতি যাহা কিছু বিহিত আছে সমস্তই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। দুঃখের বিষয় অনেকেই পূজা প্রভৃতিকে যোগপ্রণালী বলিয়া নির্দ্দেশ করে না।... সাকার প্রতিমা পূজার চরম লক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানের উপায় সাকার উপাসনা সাকার উপাসনা হইতেই নিরাকার জ্ঞান হয়।' অন্যপক্ষে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "সাকার মূর্ত্তি আমাদিগকে সহায়তা করে না, ব্রহ্মকে দূরে লইয়া দুষ্প্রাপ্য করিয়া দেয়।" বিষয়টি গুরুতর—অতএব এ-বিষয়ে এখানে কিছু বিস্তৃত আলোচনা করিব। হিন্দুরা সচরাচর যে সন্ধ্যা পূজা ইত্যাদি করিয়া থাকে তাহাই বস্তুতঃ যোগ কি না গীতা-প্রদত্ত লক্ষণ ধরিয়াই তাহার মীমাংসা সহজে হয়। গীতা বলিয়াছে—যাঁহার মন সকল প্রকার কামনা হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইয়াছে, চিত্ত এমনভাবে সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যাহার উপমা বায়ুশূন্য স্থানে দীপশিখা তিনিই যোগী। হিন্দুদের মধ্যে যাঁহারা আজীবন নিয়মিত সন্ধ্যা পূজা ইত্যাদি করিতেছেন—তাহাদের মধ্যে কয়জন গীতাবর্ণিত এই যুক্ত অবস্থা লাভ করিয়াছেন? বাহ্যতঃ দেখিলে মনে হয় হিন্দুর পূজার মধ্যে যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম, ধারণা ধ্যান সবই রহিয়াছে—কিন্তু এ-সবই যন্ত্রবৎ করা হয় যাহারা ইহা করেন তাঁহারা অনেকেই এই সব প্রক্রিয়ার প্রকৃত মর্ম বুঝেন না—তাই তাঁহারা যোগের লক্ষ্য সমাধির অবস্থা লাভ করেন না। রামপ্রসাদ শ্যামাসঙ্গীত গান করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। গ্রামোফোনের রেকর্ড যদি শ্যামাবিষয়ক গান গায়, কিম্বা হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করে—তাহা হইলে কি ঐ রেকর্ডের মুক্তি বা সিদ্ধিলাভ হইবে? আমরা এমন কথা বলি না যে সকলেই যন্ত্রবৎ পূজা ইত্যাদি করিয়া থাকেন। তবে যোগসাধনা বাহ্য জিনিষ নহে অন্তরের জিনিষ—যাহার মধ্যে যতখানি আন্তরিকতা আছে তিনি তেমনিই ফল লাভ করেন। জানিয়া বুঝিয়া যোগ সাধনা না করিলে তাহা যোগ সাধনাই নহে—কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই হিন্দুর পূজা আদি অতিশয় অজ্ঞভাবে করা হয় যাঁহারা সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পূজা করেন তাঁহারা তাহার অর্থ বুঝেন না। ইহাতে কি ফল লাভ হইবে? এই জন্যই গীতা এই সব বাহ্য পূজার আড়ম্বরে উৎসাহ দেয় নাই। বলিয়াছে ভক্তিভরে পত্র, পুষ্প ফল, জল যাহা কিছু ভগবানকে অর্পণ করিলেই প্রকৃত পূজা হয়। এখানে আসন, প্রাণায়াম মন্ত্র ইত্যাদি নাই বটে—কিন্তু সরল ভক্তি আছে আন্তরিকতা আছে,—তাই সেই পূজা উপহার ভগবানের গ্রহণযোগ্য হয় এবং ভগবান ও পূজারীর প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী তাহাকে কৃপা করেন।

পূর্ণচন্দ্র প্রতিমা পূজাকে বলিয়াছেন সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। কারণ সম্প্রজ্ঞাত সমাধির যাহা প্রথম অবস্থা—সবিতর্ক সমাপত্তি, তাহাতে স্থূল বিষয়কে অবলম্বন করিয়া চিত্ত স্থির করিতে হয় এবং প্রতিমা এইরূপ ধ্যেয় বিষয় হইতে পারে। কিন্তু গীতা বা পাতঞ্জল দর্শনের যুগে হিন্দুদের মধ্যে এখনকার মত প্রতিমা পূজা প্রচলিত ছিল না—পুরাণ ও তন্ত্র হইতেই প্রতিমা পূজার উদ্ভব। ধ্যান ধারণার অবলম্বন স্বরূপ পাতঞ্জল দর্শনে বলা হইয়াছে,

দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা ॥৩।১

অপর বিষয় হইতে চিত্তকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া নাভিচক্র প্রভৃতি অন্তর্বিষয়ে অথবা কোন বাহ্য বস্তুতে তাহাকে স্থির করার নাম ধারণা। এই সূত্রের ভাষ্যে বলা হইয়াছে নাভিচক্রে, হৃদয়পুণ্ডরীকে, মূর্দ্ধিজ্যোতিষি, নাসিকাগ্রে, জিহ্বাগ্রে, ইত্যেবমাদিষু দেশেষু, বাহ্যে বা বিষয়ে, চিত্তস্য বৃত্তিমাত্রেণ বন্ধ ইতি ধারণা।

প্রাচীনকালে হৃদয়ই ধারণার প্রধান স্থান ছিল। গীতাও বলিয়াছে মনো হৃদি নিরুধ্য চ। তবে গীতা ভ্রূর মধ্যে এবং মস্তকে প্রাণ স্থাপনের কথাও বলিয়াছে। পরে ষট্‌চক্র বা দ্বাদশচক্রে ধারণার প্রচলন হইয়াছিল। গীতা মানবরূপী অবতার শ্রীকৃষ্ণকেই ধ্যানের স্থূল বিষয় করিতে বলিয়াছে—এবং সূক্ষ্ম বিষয়রূপে আত্মাতে চিত্ত স্থির করিতে বলিয়াছে। সাধারণে যাহাতে ধ্যান ধারণায় সহজে অভ্যস্ত হয় সেই জন্যই পুরাণ ও তন্ত্রে নানা দেবদেবীর প্রতিমা পূজা প্রচলিত হইয়াছিল। প্রতিমা-ধ্যানে মন অভ্যস্ত হইলে ক্রমশঃ তাহা সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর তত্ত্ব অবধারণ করিতে সক্ষম হইবে এবং ইহা যোগপন্থারই অনুযায়ী। প্রতিমা পূজায় অনেক অজ্ঞান ও কুসংস্কার প্রবেশ করিয়াছে—কিন্তু মূলতঃ ইহাতে কোন দোষই নাই, বরং ইহা অধ্যাত্মসাধনায় বিশেষ সহায় হইতে পারে—শ্রীরামকৃষ্ণ, বামাখ্যাপা প্রভৃতি আধুনিক যুগের সাধকগণ নিজেদের জীবনে ইহা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। অনেকে বলিয়া থাকেন পুরাণ ও তন্ত্রে যে প্রতিমা পূজা প্রচলিত হইয়াছিল—তাহা বৈদিক ধর্ম্মের অবনতিরই পরিচায়ক। ইহার উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন—

"The Puranic cults have been characterised as a degradation of the Vedic religion, but they might conceivably be described, not in the essence, for that remains always the same, but in the outward movement, as an extension and advance. Image worship and temple cult and profuse ceremony,

to whatever superstition or externalism their misuse may lead, are not necessarily a degradation. The Vedic religion had no need of images, for the physical signs of its godheads were the forms of physical Nature and the outward universe was their visible house. The Puranic religion worshipped the physical forms of the Godhead within us and had to express it outwardly in symbolic figures and house it in temples that were an architectural sign of cosmic significances. And the very inwardness it intended necessitated a profusion of outward symbol to embody the complexity of these inward things to the psychical imagination and vision." (A Defence of Indian Culture).

বেদ ও পুরাণে মূলত কোন ভেদই নাই তবে বাহ্য প্রতীক ও অনুষ্ঠানের যুগপ্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্ত্তন ও প্রসার হইয়াছে। বেদে সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি শক্তিসকলকে দেবতাদের প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হইত। ক্রমে দেবদেবী সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রসার ও গভীরতা হয় এবং সাধারণকে কিছু ধারণা দিবার জন্য স্থূল প্রতিমা পূজার প্রচলন করা হয়। জগতের মূলে যে ভাগবত চৈতন্য রহিয়াছে তাহাতে রহিয়াছে চারিটি দিক—জ্ঞান, শক্তি, সৌন্দর্য্য, নিপুণ কর্ম্ম। জগন্মাতার এই চারিটি ভাব বুঝাইতে যথাক্রমে মহেশ্বরী, মহাকালী, মহালক্ষ্মী মহাসরস্বতীর কল্পনা করা হইয়াছিল এবং তদনুরূপ এই সব দেবীর প্রতিমাও কবি ও শিল্পীগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। আর এই সকল ভাবের একত্র সমাবেশ আমরা দেখিতে পাই বাঙ্গালীর শ্রীদুর্গা প্রতিমায়। মানুষকে এই মর্ত্ত্যধামে যে দিব্য ভাগবত জীবন লাভ করিতে হইবে, দিব্য জ্ঞান, শক্তি, সৌন্দর্য্য নিপুণতা লাভ করিতে হইবে, আসুরিক প্রবৃত্তিকে ধ্বংস করিতে হইবে, পাশবিকতাকে বশীভূত করিতে হইবে—শ্রীদুর্গা প্রতিমা তাহারই প্রতীক। এই সব প্রতিমা পূজা ও ধ্যান করিয়া চিত্তচাঞ্চল্য দূর করা হয়, যোগশক্তি লাভ করা হয়, অন্যদিকে এই সবের ভিতর দিয়া গভীর অধ্যাত্ম তত্ত্বগুলি সহজেই সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হয়—এবং এই সব পূজা উৎসবের ভিতর দিয়াই ভারতবাসী যেমন অধ্যাত্ম-জীবনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে জগতের অন্যত্র তাহা দেখা যায় নাই। রবীন্দ্রনাথ

ব্রাহ্ম হইয়াও প্রতিমা পূজার সার্থকতা স্বীকার করিয়াছেন—তবে অন্ধভাবে প্রতিমা পূজা করিলে যে কুফল হয় তাহাও তিনি স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, 'মূর্ত্তি যদি যথার্থ ভাবসূচক হয় তবে তাহা অবলম্বন করিয়া পূজা নিরর্থক হয় না। কিন্তু সাধারণতঃ প্রাকৃতজনে মূর্ত্তিতে বিশেষ ফল-দায়ক বস্তুগুণ আরোপ করে এবং সেই সকল মূর্ত্তির সহিত সংশ্লিষ্ট নানা কাহিনীর দ্বারা তাহার ভাবব্যঞ্জনাকে নষ্ট করিয়া দেয়। এই সকল পূজার অনেক অংশই অবৈদিক অনার্য্যজাতিদের নিকট হইতে আগত, এই কারণে তাহাতে তামসিকতা প্রবল, এই কারণে তাহা অন্তরের বিষয়কে স্থূল ভৌতিক রূপ দিয়া সমস্ত দেশের চিত্তকে নানাবিধ অর্থহীন মূঢ়তায় ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে। ধর্ম্মের নামে যে জাতি বুদ্ধিকে শৃঙ্খলিত করে তাহার দুর্গতির সীমা থাকে না।

আমাদের দেশে প্রতিমা পূজাকে কেন্দ্র করিয়া বার মাসে যে তের পরব হয়, তাহাতে প্রাকৃত জনের বৈচিত্র্যহীন শুষ্ক জীবনে রসের ধারা প্রবাহিত হয়, জাতীয় জীবনে তাহার মূল্য কম নহে অতএব যতদিন উন্নততর অনু-ষ্ঠানের ব্যবস্থা করা না যাইতেছে ততদিন সাধারণের এই সকল পূজা অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করা উচিত হয় না—তবে যাহাতে তাহারা নিতান্ত অন্ধ ও মূঢ়ভাবে এই পূজা না করে প্রতিমার অন্তর্নিহিত অর্থটি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে সাধারণকে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা হইলেও এই সব পূজা, বন্দনা, স্তোত্র, কখনই যোগের স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। যোগের প্রকৃত লক্ষ্য হইতেছে আমাদের দেহ, প্রাণ, মনের পশ্চাতে যে আত্মা রহিয়াছে যাহা আমাদের প্রকৃত সত্তা পাকা আমি তাহার সন্ধান লাভ করা এবং সাক্ষাৎ-ভাবে তাহার প্রেরণা ও পরিচালনায় বাহ্য জীবন ও কর্ম্মকে গঠিত নিয়ন্ত্রিত করা। শুধু বাহ্য পূজা, স্তোত্রপাঠ, নাম সঙ্কীর্ত্তন করিলেই আত্মা বা ভগবানের দর্শন মিলে না। বাহ্য বিষয় হইতে মন ও প্রাণকে প্রত্যাহৃত করিয়া অন্তর্মুখী করিতে পারিলেই আত্মার সন্ধান মিলে—এই অবস্থারই দৃষ্টান্তস্বরূপ গীতা নিশ্চল দীপশিখার উল্লেখ করিয়াছে—এই অন্তর্মুখীনতা ও নিশ্চল নীরবতা অভ্যাস করাই প্রকৃত রাজযোগ—ধারণা, ধ্যান সমাধি ইহার অন্তরঙ্গ সাধন। তবে পূজা আদির দ্বারা মানুষের মন প্রাণ এই যোগ সাধনার জন্য প্রস্তুত হয় সেইজন্যই তাহাদিগকে যোগের বহিরঙ্গ বলা হইয়াছে। যম ও নিয়ম হইতেছে দুইটি প্রথম বহিরঙ্গ। নৈতিকতা বলিতে যাহা বুঝায় তাহাই "যম"—যথা অহিংসা, সত্য, আস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ। মহাত্মা গান্ধী এইগুলিকেই আধ্যাত্মিকতা বলিয়াছেন—কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ-সব হইতেছে বহিরঙ্গ মাত্র। নাম, জপ, পূজা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা সন্ধ্যা বন্দন—এ-সব হইতেছে "নিয়ম,"

ক্রিয়াযোগ—ইহারাও বহিরঙ্গ। শুধু এইসব লইয়া থাকিলে কোন দিনই অধ্যাত্মজীবন বা মুক্তি লাভ করা যাইবে না, আত্মা বা ভগবানের দর্শন মিলিবে না। সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে থাকিয়া আভ্যন্তরীণ যোগ অভ্যাস করিযাই মানুষ নিজের প্রকৃত সত্তার ও ভগবানের সাক্ষাৎলাভ করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারে।

প্রতিমা পূজা বা অন্য প্রকার বাহ্য অনুষ্ঠান হইতেছে প্রাথমিক বহিরঙ্গ সাধনা—অতএব এ-সব সম্বন্ধে কোনরূপ বাঁধাধরা নিয়ম থাকা উচিত নহে—যাহার পক্ষে যেরূপ উপযোগী হয তাহাকে সেইরূপ ভাবেই পূজা উপাসনা করিবার সুযোগ ও স্বাধীনতা দেওয়া কর্ত্তব্য। হিন্দুরা প্রতিমা পূজা করে বলিয়া তাহাদিগকে যেমন নিন্দা করা উচিত নহে, মুসলমানেরা প্রতিমা পূজা করে না, মসজিদে গিয়া উপাসনা করে বলিয়া তাহাদিগকেও নিন্দা করা বা বাধা দেওয়া অন্যায়। কোন না কোন রকমে প্রতীকের সাহায্য সকলকেই লইতে হয। ভগবানকে আল্লা বা God বলিয়া উপাসনা করাও প্রতীক উপাসনা—কারণ ঐ শব্দগুলিই ভগবান নহে, পরন্তু তাঁহারই সূচক শব্দময প্রতীক। হিন্দুরা এই শব্দপ্রতীকও ব্যবহার করে, আবার কবিত্বপূর্ণ রূপময প্রতীকেরও সাহায্য গ্রহণ করে—তাহাই প্রতিমা। রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম, প্রতিমা-পূজা করেন নাই—কিন্তু তিনিও ভগবানের সাকার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া উপাসনা করিযাছেন। তাঁহার গানে সর্ব্বত্রই আমরা সাকার ভগবানের আবাহন দেখিতে পাই। যথা,

সংসার পথ সঙ্কট অতি
কণ্টকময় হে
(আমি) নীরবে যাব হৃদযে লয়ে
প্রেম-মূরতি তব।

রবীন্দ্রনাথ কিরূপ প্রেম-মূর্ত্তি হৃদযে ধ্যান করিতেন তাঁহার কোন ইঙ্গিত দেন নাই। হিন্দু সাধকগণ সাধারণের সাহায্যের জন্য তাঁহাদের ধ্যানের মূর্ত্তি-গুলির বর্ণনা দিয়াছেন, শিল্পীগণ সেইগুলিকেই মাটি বা প্রস্তরে রূপ দিয়াছেন। সেইগুলি অবলম্বন করিয়া মনকে স্থির করা যায। সাধক কমলাকান্ত যেমন গাহিযাছেন,

মজ্‌লো আমার মন-ভ্রমরা
কালীপদ নীলকমলে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গীতা কোন প্রতিমা বা অন্য কোন স্থূল বস্তুকে অবলম্বন করিয়া যোগ অভ্যাস করিতে বলে নাই—পরন্তু মানবরূপী শ্রীকৃষ্ণেই

চিত্ত নিবিষ্ট কবিতে বলিযাছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনেব সম্মুখে সশবীবে উপস্থিত ছিলেন—তাঁহাব সহিত সকল প্রকাব জীবন্ত ও মধুব সম্পর্ক স্থাপন কবা, তাঁহাকে ভালবাসা, মন প্রাণ তাঁহাকেই অর্পণ কবা অর্জুনেব পক্ষে সম্ভব ছিল। কিন্তু এখন যাহাবা সাধনা কবিবে—তাহাবা কি অবলম্বন কবিবে? প্রতিমা পূজা ঠিক মত কবিতে পাবিলে চিত্তস্থৈর্যসাধনে অনেক সহাযতা হইতে পাবে—কিন্তু প্রকৃত অধ্যাত্ম জীবন লাভ কবিতে হইলে যোগেব দ্বাবা আত্মাব দর্শন লাভ কবিতে হইবে। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায বলা হইযাছে

ইজ্যাচাবদমাহিংসাদানস্বাধ্যাযকর্ম্মণাম্।
অযন্তু পবমো ধর্ম্মো যদ্‌যোগেনাত্মদর্শনম্॥

অর্থাৎ যোগেব দ্বাবা যে আত্মসাক্ষাৎকাব তাহাই ইজ্যা আচাব দম, অহিংসা দান ও স্বাধ্যায (নামজপ শাস্ত্রাধ্যযন ইত্যাদি) এই সমস্ত ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। পূজাব মধ্যে ধ্যানেব ব্যবস্থা আছে বটে কিন্তু তাহা নাম মাত্র—তাহাতে আত্ম-দর্শন হয না। আব ইহাও মনে বাখা কর্ত্তব্য যে, যুগে যুগে পূজা আদি বাহ্য অনুষ্ঠানেব অনেক পবিবর্ত্তন হইযা গিযাছে এবং এখনও হইতেছে। যাহাবা মনে কবেন হিন্দুদেব মধ্যে এখন যে-সব পূজা পদ্ধতি চলিত আছে তাহা বেদানুগত, তাহাবা ভুল বুঝেন। অধ্যাত্মসাধনাব অন্তর্নিহিত ভাবটি ঠিক একই আছে—কাবণ তাহা সনাতন সত্য যোগেব দ্বাবা আত্মদর্শন কিন্তু মানবমনেব বিকাশ ও যুগপ্রযোজন অনুযাযী বাহ্যপ্রক্রিযাব অনেক পবিবর্ত্তন হইযা গিযাছে। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে শিব বলিতেছেন

নির্ব্বীর্য্যাঃ শ্রৌতজাতীযা বিষহীনোবগা ইব।
সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌ তে মৃতকা ইব॥২।১৫

অর্থাৎ এক্ষণে বৈদিক মন্ত্র সমুদায বিষহীন সর্পেব ন্যায নির্ব্বীর্য্য হইযাছে। ঐ সমুদয মন্ত্র সত্যাদি যুগে সফল হইত কিন্তু কলিযুগে তাহাবা মৃততুল্য অচৈতন্য ও অকর্ম্মণ্য হইযা পডিযাছে।'

কলৌ তন্ত্রোদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধাস্তূর্ণফলপ্রদাঃ।

কলিযুগে তন্ত্রোক্ত মন্ত্রসমুদায সিদ্ধ ও আশুফলপ্রদ। সমস্ত মন্ত্র জপ যজ্ঞ প্রভৃতি সমুদায কর্ম্মেতেই উত্তম প্রশস্ত। বস্তুতঃ বাংলাদেশে এখন যে-সব পূজা অনুষ্ঠান প্রচলিত সে সব হইতেছে বেদ পুবাণ তন্ত্রেব মিশ্রণ। ইহা হইতে আমবা এই শিক্ষা লাভ কবিতে পারি যে পূজা পদ্ধতি সম্বন্ধে কোনরূপ গোঁডামিকে প্রশ্রয দেওযা ঠিক নহে। যাহাব যেমন উপযোগী মনে হয তাহাকে সেই-ভাবেই পূজা উপাসনা কবিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু এহো বাহ্য, এ-সবই হইতেছে বহিবঙ্গ, যোগেব দ্বাবা আত্মাব সন্ধান পাওযাই পরম ধর্ম্ম এবং ইহার

জন্য সদ্‌গুরুর আশ্রয় প্রয়োজন গীতায় তাহারই ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। গুরুকেই ভগবানের প্রতীক, প্রতিনিধি, অবতার জ্ঞানে পূজা ধ্যান করিলে তাঁহার অধ্যাত্ম-শক্তির সহায়ে শিষ্যের যোগজীবন, অধ্যাত্ম-জীবন গড়িয়া উঠে। হিন্দুদের মধ্যে এই গুরুবাদ বহুকাল হইতেই বদ্ধমূল। ভাগবতে ভগবান উদ্ধবকে বলিতেছেন

আচার্য্যং মাং বিজ্ঞানীয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।

ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ।। ১১।১৭।২৭

'আচার্য্য অর্থাৎ মানব-গুরুকে মৎস্বরূপ বলিয়া জানিবে তাঁহাকে কখনও অবজ্ঞা করিবে না অথবা মনুষ্যজ্ঞানে তাঁহার প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিবে না। কেননা গুরু সর্ব্বদেবময় সমস্ত দেবতার অধিষ্ঠান তাঁহাতে।"

পাতঞ্জল দর্শনেও গুরুতত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে এবং ঈশ্বরকে সকল গুরুর গুরু বলা হইয়াছে পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ (১।২৬)। উপনিষদেও গুরুতত্ত্ব স্বীকৃত এবং হিন্দুদের উপর এই গুরুতত্ত্বের প্রভাব খুবই বেশী। সাধারণ পূজা বন্দনা অধ্যাত্ম জীবনের পক্ষে যথেষ্ট নহে বুঝিয়া অনেকেই গুরুর নিকট দীক্ষা ও মন্ত্র গ্রহণ করেন কিন্তু যেমন অন্যান্য ব্যাপারে তেমনই গুরু শিষ্যের সম্বন্ধও অন্ধ ও গতানুগতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দেশে একটা ধারণা ব্যাপকভাবে বদ্ধমূল হইয়াছে যে কুলগুরুর নিকটই দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয় অন্যত্র দীক্ষা লইলে মহাপাপ হয়। আর কুলগুরুর অর্থ করা হয় বংশের গুরু—অর্থাৎ আমার পিতা পিতামহের যিনি গুরু ছিলেন তাঁহার বংশধরকেই আমাকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। গুরুতত্ত্বের ইহা অপেক্ষা অপব্যাখ্যা ও অপব্যবহার আর কিছুই হইতে পারে না। ব্রাহ্মণের কুলে জন্মগ্রহণ করিলেই যেমন কেহ ব্রাহ্মণ হয় না ব্রাহ্মণের গুণ ও ও কর্ম্ম থাকিলেই ব্রাহ্মণ হয় তেমনই গুরুর বংশে জন্মগ্রহণ করিলেই কেহ গুরু হইবার যোগ্যতা লাভ করে না—গুরু হইবার উপযোগী অধ্যাত্ম শক্তি ও জ্ঞান থাকা চাই। যত দিন গুরুতে ঈশ্বরবুদ্ধি না হয় ততদিন ঠিক গুরুলাভ হয় না—আর যে কোন লোকে ঈশ্বরবুদ্ধিও হয় না—যিনি ঈশ্বরতুল্য জ্ঞান, শক্তি, প্রেম, শান্তিতে পূর্ণ এরূপ মানুষকে গুরুরূপে পাইলেই তাহাতে ঈশ্বরবুদ্ধি করা সহজ হয়। 'যে ব্যক্তি গুরুকে যথার্থ ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারে সে নিশ্চয়ই নির্ব্বিচারে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতে সমর্থ হয় এবং এই-রূপ আত্মসমর্পণ যেদিন নিষ্পন্ন হইয়া যায় সেই দিন হইতেই সে আত্মস্বরূপের বা যোগের সন্নিহিত হইতে থাকে। এ নিয়মের অন্যথা কখনও হয় না।"

(যোগরহস্যম্)

কুলগুরু পরিত্যাগ করিয়া অন্য কাহাকেও গুরু করিলে অন্যায় বা পাপ হইবে এইরূপ আশঙ্কা যাহারা করিয়া থাকেন তাহাদের অবগতির জন্য এখানে বলা যাইতে পারে যে, কুলগুরুর অর্থ বংশের গুরু নহে। এখানে "কুল" শব্দের অর্থ তান্ত্রিক সাধনা। কুল শব্দের ব্যাখ্যায় মহানির্ব্বাণতন্ত্রে বলা হইয়াছে,

সদ্‌গুরোঃ সেবয়া প্রাপ্য বিদ্যামেনাং পরাৎপরাম্।
কুলাচাররতা ভূত্বা পঞ্চতত্ত্বৈঃ কুলেশ্বরীম॥ ৭।১০১

'যাহারা সদ্‌গুরুর সেবা করিয়া পরাৎপরা এই বিদ্যা লাভপূর্ব্বক কুলাচারে নিরত হইয়া পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা কুলেশ্বরী আদ্যাকালিকার পূজা করে, তাহারাই কুলজ্ঞ এবং তাহারাই সাধকবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই সমুদয় কৌল (কুলতত্ত্বজ্ঞ) সাধক ইহলোকে নিখিল সুখ সৌভাগ্য সম্ভোগ করিয়া অন্তিমকালে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (৭।১০১ ১০২)

প্রাচীনকালে উপনয়নই ছিল দীক্ষা বৈদিক দীক্ষা। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতি গুরুর আশ্রমে গিয়া সাবিত্রীমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিত। সেখানে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক যথানিয়মে বাস করিয়া এবং শিক্ষা লাভ করিয়া ৩০ বৎসর বা ২৫ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে দারপরিগ্রহ করিয়া তাহারা গৃহস্থ সংসারী হইত। গুরু যে শিক্ষা দিতেন তাহা ছাড়া আর অন্য কোন দীক্ষার প্রয়োজন হইত না। পরে তন্ত্রের প্রভাব হইলে এই নিয়ম হয় যে, ঐরূপ বৈদিক দীক্ষাই যথেষ্ট নহে, তান্ত্রিক দীক্ষাও চাই ইহাই হইল কুলগুরু প্রথার আরম্ভ। সংসারত্যাগী ব্রহ্মচারীর বৈদিক দীক্ষাতেই কাজ হয় গৃহীদের তান্ত্রিক দীক্ষার প্রয়োজন। তবে সে দীক্ষা পূর্ব্বপুরুষদের গুরুর বংশের কাহারও নিকট হইতে লইবে এমন কোন কথা ছিল না—যিনি তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছেন এইরূপ লোকই কৌলগুরু বা কুলগুরু হইবার যোগ্য। কিন্তু সকলকেই এইরূপ 'কুল''গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা লইতেই হইবে এইরূপ দাবী সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি ভিন্ন আর কিছুই নহে। তান্ত্রিক সাধনা যে একটি শক্তিশালী সাধনা সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই তবে উহাই একমাত্র সাধনা বা মুক্তির পথ বা সকলকেই ঐ সাধনা করিতে হইবে ইহা অতিশয় সঙ্কীর্ণ গোঁড়ামি। অধ্যাত্মসাধনায় গুরু চাই। প্রাচীনকালের সেই বৈদিক আচার আর নাই। কয়জন লোক ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত গুরুগৃহে বাস করিয়া ২০ বৎসর গার্হস্থ্য ধর্ম্মপালনের পর ৫০ বৎসরে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতেছে? এখন যুগ-প্রয়োজনে সাধনার ধারার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। গুরু এবং দীক্ষা চাই-ই নতুবা অধ্যাত্ম সাধনা হইতেই পারে না। কিন্তু কাহাকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিব তাহা শুধু বংশ বা সম্প্রদায় দেখিয়া বিচার করিলে চলিবে না। গুরু-নির্ব্বাচন

জীবনেব সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতব জিনিষ, অন্ধভাবে বা গতানুগতিক ভাবে বা অপবেব অনুকবণ কবিয়া একাজ কখনই কবা উচিত নহে। আমাব অন্তবাত্মা যাঁহাকে গুরু বলিযা মানিযা লইবে অর্থাৎ ঈশ্বব জ্ঞানে পূজা কবিতে সম্মত হইবে, যিনি আমাব মনবুদ্ধিব সংশযসকল দুব কবিযা দিবেন, আমাব মধ্যে তাঁহাব অধ্যাত্ম শক্তিব সঞ্চাব কবিযা আমাব সকল দুর্ব্বলতা ও নীচ প্রবৃত্তি দূব কবিযা দিবেন, আমাব দিব্য চৈতন্য, দিব্য জীবন গডিয়া দিবেন তাঁহাব নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ কবিযাই অধ্যাত্মসাধনা, যোগসাধনা সার্থক হইতে পাবে।

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥২০

অন্বয়। যত্র যোগসেবযা নিকদ্ধং চিত্তং উপবমতে, যত্র চ আত্মনা এব আত্মনি আত্মানং পশ্যন্ তুষ্যতি।

অনুবাদ। যে অবস্থায যোগসাধনাব দ্বাবা নিকদ্ধ চিত্ত স্থিব ও শান্ত হয এবং যে অবস্থায আত্মাব দ্বাবা আত্মাতেই আত্মাকে দেখিযা পবিতোষ লাভ হয।

ব্যাখ্যা

যত্রোপরমতে চিত্তং। অভ্যাসেব দ্বাবা যথেচ্ছ যে-কোন বিষযে চিত্তকে নিশ্চল বাখিতে পাবাই বৃত্তিনিবোধ এবং পাতঞ্জল দর্শনে ইহাকেই যোগ বলা হইযাছে। এইরূপ নিবোধ অভ্যস্ত হইলে চিত্তেব বিক্ষেপ দূব হয, তাহা স্থিব ও শান্ত হয, "উপবমতে" কথাব দ্বাবা ইহাই বুঝাইতেছে। এই কথাটিব অর্থ লইযা কিছু মতভেদ আছে। ইহাব ধাতুগত অর্থ ধবিলে বলিতে হয চিত্ত সাতিশয আনন্দ ভোগ কবে—বামানুজ এইরূপ অর্থই কবিযাছেন, অতিশযিত-সুখমিদমেবেতি। যোগসাধনাব দ্বাবা যে অত্যন্ত সুখ লাভ কবা যায গীতা পবেব শ্লোকেই তাহা স্পষ্ট ভাবেই বলিযাছে কিন্তু সে সুখ আমাদেব এই বাহ্য মন বা ইন্দ্রিয়ের নহে—তাহা হইতেছে আভ্যন্তবীণ সুখ, বাহ্য মন ইন্দ্রিয় স্থিব ও শান্ত হইলেই সেই ভিতবেব সুখ উপলব্ধি কবা যায, উপবমতে বলিতে গীতা এখানে তাহাই বুঝাইযাছে। আবাব কেহ কেহ "উপবমতে" শব্দেব ব্যাখ্যা কবিযাছেন, "বিলীনং ভবতি" অর্থাৎ চিত্ত সম্পূর্ণভাবে লয প্রাপ্ত হয। ইহাদের মতে গীতা এখানে পাতঞ্জল মতানুযাযী অসম্প্রজ্ঞাত যোগেবই বর্ণনা দিয়াছে। শ্রীধব স্বামী বলিযাছেন—"এই অধ্যায়েব প্রথমে যোগ শব্দেব দ্বারা কর্ম্মই বুঝা হইয়াছে, কর্ম্মৈব যোগশব্দেনোক্তং। কিন্তু উহা যোগেব

মুখ্য লক্ষণ নহে, যোগের যাহা মুখ্য লক্ষণ, সমাধি তাহাই এখানে কথিত হইয়াছে।" কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি গীতা এমন ভেদ করে নাই, এবং যোগ বলিতে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ বা চিত্তলয়ও বুঝে নাই। গীতার যোগে কর্ম্ম অবান্তর নহে—গীতার যোগে শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্মের স্থান আছে—কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তির সমন্বয়ই গীতার যোগ। গীতার যোগের লক্ষ্য হইতেছে—বাহিরের অজ্ঞান মানসচৈতন্য হইতে ভিতরে এক অধ্যাত্ম চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া—সেই চৈতন্যে আমরা আমাদের প্রকৃত সত্তা ও আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারি এবং সাক্ষাৎভাবে ভগবানের সহিত যুক্ত হইতে পারি এবং তাহাই যোগ শব্দের প্রকৃত অর্থ। জ্ঞান, কর্ম্ম ভক্তি সবই ইহার সহায় হয়—তাই ইহাদিগকেও যোগ বলা হয়। আবার পাতঞ্জল যে চিত্তবৃত্তি নিরোধের কথা বলিয়াছে তাহার দ্বারাও ইহাতে সহায়তা করা হয়—তাই গীতা তাহাকেও যোগ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। কোন এক বিষয় অবলম্বন করিয়া মনকে একাগ্র করিতে পারিলে মনের চাঞ্চল্য দূর হয় এবং আমরা আমাদের আভ্যন্তরীণ সত্তার সন্ধান পাই, তাহার মধ্যেই বাস করিতে পারি।

নিরুদ্ধং যোগসেবয়া। পাতঞ্জল দর্শনে বলা হইয়াছে, যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ (১।২), আর গীতাতে বলা হইয়াছে, চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া। এখানে ভাষার সাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয়—একে অপরের নিকট হইতে এই তত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছে। গীতার প্রাচীন ব্যাখ্যাকারগণ গীতার যোগ ব্যাখ্যা করিতে যে ভাবে পাতঞ্জলকে টানিয়া আনিয়াছেন তাহা হইতে মনে হয় যে, তাহাদের মতে গীতা ঐ কথাগুলি পাতঞ্জল দর্শন হইতেই গ্রহণ করিয়াছে। তাহা হইলে গীতারচনার কাল হয় পাতঞ্জল সূত্রের পরবর্ত্তী। পাতঞ্জল সূত্রে কয়েক স্থানেই বৌদ্ধমতের খণ্ডন আছে, তাহা হইতে বলিতে পারা যায় যে, পাতঞ্জল দর্শন বুদ্ধের পরবর্ত্তী গীতা তাহারও পরে রচিত হইয়াছে। কিন্তু এ-সব কেবল আন্দাজ মাত্র, কারণ পাতঞ্জল সূত্রকারই যে গীতা হইতে ঐ কথাগুলি গ্রহণ করেন নাই—বা উভয়েই কোন প্রাচীনতর গ্রন্থ হইতে ঐ কথাগুলি গ্রহণ করেন নাই—সে-সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছুই বলা যায় না। তবে গীতার মধ্যে যেমন রাজযোগের বিস্তৃত বর্ণনা আছে, পাতঞ্জল দর্শনের মধ্যে গীতার যোগের বিশেষ উল্লেখ কোথাও দেখা যায় না। তাহা ছাড়া পাতঞ্জল শুধু রাজযোগেরই বর্ণনা করিয়াছে এবং সেজন্য সাংখ্য দর্শনকেই ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু গীতার যোগ হইতেছে সমন্বয়মূলক, ইহাতে যেমন রাজযোগের স্থান আছে, তেমনই জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ ভক্তিযোগের স্থান আছে—এবং এই সমন্বয়কে দার্শনিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য গীতা যেমন সাংখ্যদর্শনের

সাহায্য গ্রহণ কবিযাছে—তেমনই অন্যান্য দর্শনেব সাহায্যও গ্রহণ কবিযাছে —এবং এই দার্শনিক সমন্বয কবিতে গীতা সকল ভাবতীয দর্শনেব মূল উপনিষদে ফিবিযা গিযাছে এবং নূতন অধ্যাত্ম-উপলব্ধিব আলোকে নূতন সমন্বয সাধন কবিযাছে। ইহা হইতে প্রতীযমান হয যে, গীতা ভাবতেব বিভিন্ন দার্শনিক মত প্রচাবিত হইবাব পবেই বচিত হইযাছিল। তবে সেই সব দর্শন ব্রহ্ম-সূত্রাদি গ্রন্থেব ন্যায সূত্রাকাবে বচিত হইবাব পূর্ব্বে বা পবে গীতা বচিত হইযাছে সে-সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওযা যায নাই।

"নিবোধ" শব্দেব অর্থ আমবা পূর্ব্বেই ব্যাখ্যা কবিযাছি—চিত্তকে এমন ভাবে নিশ্চল কবা যেন তাহাতে কোনরূপ জ্ঞান ইচ্ছা বা সুখদুঃখবোধেব উদয না হয। কিন্তু এইসব চিত্ত-চেষ্টা নিরুদ্ধ হইলেও তাহাদেব সংস্কাব থাকে—অর্থাৎ পূর্ব্বে যে এইসব চেষ্টা হইযাছে তাহাদেব ছাপ বা ধৃতভাব থাকে এই ছাপকেই সংস্কাব বলে। যতক্ষণ এই সকল সংস্কাববে নির্ম্মূল কবিতে পাবা না যাইবে—ততক্ষণ সে-সব হইতে আবাব চিত্তবৃত্তিব উদ্ভব হইবে, সমাধি ভঙ্গ হইবে। কিন্তু সমাধিকালে যে প্রজ্ঞা হয তাহাবও সংস্কাব থাকিযা যায—সেই সব সংস্কাব অন্য সংস্কাবেব প্রতিবন্ধী (পাতঞ্জল দর্শন ১।৫০), সমাধি-প্রজ্ঞা-জাত সংস্কাব সাধাবণ চৈতন্যেব সংস্কাব-সকলকে নিবাবিত কবে। অতএব পুনঃপুনঃ এইরূপে সমাধি অভ্যাস কবিলে চিত্তেব সাধাবণ ক্রিযা-সকল নিবৃত্ত হয, কেবল বিবেকখ্যাতি থাকে অর্থাৎ পুরুষ যে প্রকৃতি হইতে ভিন্ন এই চবম জ্ঞানটুকু থাকে। পববৈবাগ্যেব দ্বাবা এই জ্ঞানও যখন লুপ্ত হয তখনই চিত্ত সম্পূর্ণভাবে লয হয, তাহাই নির্ব্বীজ সমাধি, পাতঞ্জল যোগেব লক্ষ্য—

তস্যাপি নিবোধে সর্ব্বনিবোধাৎ
নির্ব্বীজঃ সমাধিঃ।১।৫১

চিত্ত নিবৃত্ত হইলে পুরুষ স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হয, তাহাই কৈবল্য।

কিন্তু এইরূপ কৈবল্যলাভ গীতাব লক্ষ্য নহে। চিত্তে যে-সব অজ্ঞান সংস্কাব সঞ্চিত আছে সেই সবকেই জ্ঞানজ সংস্কাবেব দ্বাবা নির্ম্মূল করিতে হইবে —এইরূপ সত্যজ্ঞানেব আলোকে আলোকিত চিত্ত বা মনই গীতাব মতে মুক্ত-পুরুষের লক্ষণ। আব পাতঞ্জলেব মতে মুক্ত পুরুষেব লক্ষণ হইতেছে যেখানে চিত্ত মূল প্রকৃতিতে বিলীন হইয়াছে। গীতাব মতে যোগ অভ্যাসেব দ্বারা চিত্তকে একাগ্র করিতে পাবিলে, ঊর্দ্ধ্ব হইতে জ্ঞান, শান্তি, শক্তি আনন্দ নামিয়া চিত্তকে পূর্ণ করে এবং তখনই হয অধ্যাত্মজীবন।

চিত্তে যখন কোনরকম বৃত্তি না উঠে তাহাকেই নিরোধ বলে—এই অবস্থায় কতক কাল থাকিতে পারিলেই তাহাকে সমাধি বলা হয়। পাতঞ্জলের মতে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে, শরীরের, মনের ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্যও সম্যক বোধ হইবে। কাপিলাশ্রমীয় যোগদর্শনে বলা হইয়াছে— শরীর চলিলে তাহা চিত্তের দ্বারাই চালিত হয়, নিরুদ্ধ চিত্তের দ্বারা শরীর চালিত হইতে পারে না। নিরোধকালে সমস্ত যান্ত্রিক ক্রিয়া যথা জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় ও হৃৎপিণ্ডাদি প্রাণেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সমস্ত রুদ্ধ হইবে, কারণ আমিত্বই ঐ যন্ত্রসকলের সংহত-ক্রিয়ার মূল কেন্দ্র ও প্রযোক্তা। অতএব নিরোধের বাহ্য লক্ষণ দেখিতে গেলে প্রথমে শারীর ক্রিয়া সকলের রোধ। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ঐরূপ শরীর নিরোধ না করিতে পারিলে কেহ যোগের নিরোধ অবস্থায় যাইতে পারিবেন না।'' এই জন্যই পাতঞ্জল দর্শনে হঠযোগের আসন ও প্রাণায়াম রাজযোগের অবশ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। রাজযোগীরা সমাধির সময় মৃতবৎ থাকেন—মাটির মধ্যে তাহাদিগকে প্রোথিত করিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছে, তখন তাহাদের কোনরূপ প্রাণক্রিয়া চলে না। গীতা এরূপ সমাধির আদর্শ গ্রহণ করে নাই। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞ সমাধিস্থ ব্যক্তির লক্ষণ বলা হইয়াছে, যিনি সকল বাসনাকামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং আত্মাতেই তুষ্ট তিনিই সমাধিস্থ (২।৫৫)। অতএব চিত্তের অজ্ঞান সংস্কারসকল দূর করিয়া বাসনাকামনাকে নির্ম্মূল করাই গীতার লক্ষ্য। বাসনা, কামনা, আমিত্ব এসব হইতেছে অজ্ঞান অবিদ্যার ক্রিয়া, অপরা প্রকৃতির ক্রিয়া—কিন্তু ইহাদের উর্দ্ধে আর এক প্রকৃতি আছে, পরা প্রকৃতি, তাহা বিদ্যাময়ী, জ্ঞানময়ী। সাংখ্য ও পাতঞ্জল এই পরা প্রকৃতির সন্ধান পায় নাই, তাই তাহাদের মতে বাসনা, কামনা, আমিত্ব দূর হইলেই দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াও আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যায়। গীতার মতে তখনই আমাদের দেহ, প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়ে বিদ্যাময়ী পরা প্রকৃতির ক্রিয়া আরম্ভ হয়, প্রকৃত অধ্যাত্ম দিব্য জীবনের সূত্রপাত হয়। কিন্তু ইহার জন্য অপরা প্রকৃতির ক্রিয়া-সকলকে নিরুদ্ধ করা প্রয়োজন এবং এ-বিষয়ে সাংখ্য ও পাতঞ্জলের সহিত গীতার মিল রহিয়াছে। অপরা প্রকৃতির ক্রিয়া বাসনা কামনাদিকে জয় করিতে রাজযোগোক্ত একাগ্রতা ও ধ্যান অভ্যাস খুবই উপযোগী—তাই গীতা ইহা অভ্যাস করিতে বলিয়াছে। এইরূপ অভ্যাসের সময়ে যে শরীর নিশ্চল ও প্রাণক্রিয়া অনেকখানি রুদ্ধ হইতে পারে গীতা তাহাও অস্বীকার করে নাই, পঞ্চম অধ্যায়ে রাজযোগের বর্ণনা করিতে গীতা বলিয়াছে, প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ—অর্থাৎ সে সময়ে যোগীর নিঃশ্বাস

বাহিবে পড়ে না। তবে আমাদিগকে মনে বাখিতে হইবে যে, এইরূপ একাগ্রতা চিত্তজযে খুব সহায হইলেও ইহা অপবিহার্য্য নহে। ক্ষেত্র বিশেষে সামযিক-ভাবে ইহা অভ্যাস কবা যাইতে পাবে।

যত্র চৈবাত্মনাত্মানং। মনেব যে স্বাভাবিক বহির্ম্মুখী গতি তাহা বন্ধ কবিলে মন শান্ত ও নীবব হয—গীতাব মতে তাহাই নিবোধ। মন এইরূপ স্থিব ও শান্ত হইলে ভিতবে আত্মা আপনি প্রকাশিত হয এবং তখন জীব পবম পবিতোষ লাভ কবে। আত্মা আমাদেব মধ্যেই বহিযাছে, কিন্তু তাহাকে আমবা জানি না, মন সে আত্মা সম্বন্ধে সঠিক ধাবণা কবিতে পাবে না, আত্মাব আংশিক বা বিকৃত প্রতিভাস দেয, "অহং"কেই আমবা আমাদেব আত্মা বলিযা মনে কবি এবং ইহাই জীবনেব যত দুঃখ, দ্বন্দ্ব ও অশান্তিব মূল। যোগ-অভ্যাসেব দ্বাবা মন নিরুদ্ধ হইলে আত্মাকে আমবা আত্মাব জ্যোতিতেই আমাদেব নিজেদেব মধ্যে দেখিতে পাই, আত্মা স্বপ্রকাশ, আত্মনা আত্মনি আত্মনং পশ্যন্ বলিতে গীতা ইহাই বুঝাইযাছে।

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্‌বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥ ২১

অন্বয়। অযং বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ অতীন্দ্রিযম্ আত্যন্তিকম্ যৎ সুখং তৎ বেত্তি, যত্র চ স্থিতঃ তত্ত্বতঃ ন চলতি।

অনুবাদ। তখন যোগী ইন্দ্রিযাতীত বুদ্ধিগ্রাহ্য নিবতিশয সুখ অনুভব কবেন, সে অবস্থায তিনি আব আত্মস্বরূপ হইতে কিছুতেই বিচ্যুত হন না।

ব্যাখ্যা

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্। ইন্দ্রিয-সুখকেই মানুষ সুখ বলিযা জানে এবং সেইসুখেব সন্ধানেই তাহাব জীবন অতিবাহিত হয। যোগসাধনাব পথে অগ্রসব হইতে হইলে মানুষকে এই ইন্দ্রিয-সুখেব প্রতি আসক্তি সম্পূর্ণভাবে বর্জন কবিতেই হইবে—কোন প্রকাব ইন্দ্রিযভোগেব কামনা পোষণ কবা চলিবে না। তাহা হইলে মানুষ কেন যোগেব পথে পদার্পণ কবিবে? তাই এখানে গীতা বলিতেছে—যোগেব দ্বাবা যে সুখ পাওযা যায ইন্দ্রিযভোগেব সুখ অপেক্ষা তাহা অনেক বেশী। ইন্দ্রিয-সুখ ক্ষণিক, তাহাব সহিত সকল সমযেই দুঃখ মিশ্রিত—কিন্তু যোগলব্ধ সুখ চিবস্থাযী, গভীব, গাঢ়—তাহাতে দুঃখকষ্টেব লেশ মাত্র নাই, দুঃখেব সহিত যোগীব হয চিববিচ্ছেদ। মানুষ দুঃখ চাহে না, সুখই চায়, অতএব একমাত্র যোগসাধনার দ্বাবাই তাহাব জীবন সার্থকতা লাভ কবিতে পারে।

ইন্দ্রিয়সুখকেই আমরা বাস্তব সুখ বলিয়া মনে করি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা হইতেছে আত্মানন্দের ক্ষীণ প্রতিচ্ছায়া—আমাদের বিকৃত অশুদ্ধ অপরিণত ইন্দ্রিয় সে আত্মানন্দকে ঠিক মত প্রকট করিতে পারে না, তাই তাহা সুখ দুঃখের দ্বন্দ্বরূপে অথবা ক্ষুদ্র অল্প সুখরূপে অনুভূত হয়। আত্মার শক্তিতে যখন দেহ, মন, ইন্দ্রিয়ের রূপান্তর ও পূর্ণতা সাধিত হইবে তখন ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়াও সেই আত্মানন্দই বিচিত্রভাবে অনুভূত হইবে—শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া ভোগ গ্রহণ করিয়াও যোগীর আর কোন বিকার বা পতন হইবে না, কারণ একবার যে আত্মাকে লাভ করিয়াছে, আত্মানন্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার আর পতন হয় না, হইতে পারে না, তত্ত্বতঃ ন চলতি। কিন্তু এই আত্মানন্দ লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে অশুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের তুচ্ছ ও বিকৃত ভোগের প্রতি সকল আসক্তি ও কামনা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিতে হইবে—সমস্ত মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়কে অন্তর্ম্মুখী ভগবৎমুখী করিতে হইবে।

বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্। ইন্দ্রিয়সুখ আমরা বুঝি, কিন্তু ইন্দ্রিয়াতীত যে পরম আনন্দ আত্মাতে আছে তাহা আমরা কেমন করিয়া বুঝিব? তাহার অস্তিত্বে প্রমাণ কি? নিশ্চিত ইন্দ্রিয়সুখ বর্জন করিয়া কেন মানুষ অনিশ্চিত অজানা সুখের আশায় কঠিন সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে? এই প্রশ্নেরই উত্তরে গীতা বলিতেছে যে, আত্মানন্দ ইন্দ্রিয়াতীত হইলেও, বুদ্ধির দ্বারা তাহার স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা সাধারণ জীবনে ইন্দ্রিয়কে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিয়া যে-ভাবে সুখ ভোগ করি, আত্মা সেইরূপ বুদ্ধি দ্বারা সুখ ভোগ করে—ইহা বলা গীতার উদ্দেশ্য নহে। আত্মা নিজেই নিজের আনন্দ অনুভব করে, সে-জন্য বুদ্ধি বা ইন্দ্রিয় কোন করণের প্রয়োজন হয় না। আত্মা হইতেছে পুরুষ, আর বুদ্ধি হইতেছে প্রকৃতির অন্তর্গত—পুরুষ নিজের আনন্দের জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না। গীতা অন্যত্র বলিয়াছে যে, পুরুষ বা আত্মা বুদ্ধিরও অতীত, যঃ বুদ্ধে পরতস্তু সঃ (৩।৪২)। কিন্তু পুরুষ বুদ্ধির উর্দ্ধে হইলেও যখন তাহা রজঃ ও তমঃ মল হইতে মুক্ত হয় তখন তাহা পুরুষের আভাস দিতে পারে, অতএব পুরুষের আত্মানন্দেরও আভাস দিতে পারে।

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরম তত্ত্ব অধিগত হয় না; কিন্তু বুদ্ধি দ্বারা তাহা জানা যায় কি না সে বিষয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ আছে।* গীতার ন্যায়

---

* পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যে প্লেটো, হেগেল প্রভৃতির মত এই যে, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে পারে। হিউম্, ক্যাণ্ট প্রভৃতির মত ইহার বিপরীত।

কঠ উপনিষদও বলিযাছে যে, পুরুষ বুদ্ধিব অতীত। অন্যত্র ঐ উপনিষদেই বলা হইয়াছে,

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা। ২।৩।১২

বাক্যেব দ্বাবা, মনেব দ্বাবা বা চক্ষুব দ্বাবা আত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায না।

মুণ্ডকোপনিষদে—

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব-
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যাযমানঃ।৩।১।৮

"চক্ষু তাঁহাকে গ্রহণ কবিতে পাবে না বাক্য তাঁহাকে ধবিতে পাবে না, অন্য ইন্দ্রিযেবাও তাঁহাকে ধাবণ কবিতে পাবে না, তপস্যাব দ্বাবা বা কর্ম্মেব দ্বাবাও তাঁহাকে লাভ কবা যায না, কেবল যখন জ্ঞানপ্রসাদেব দ্বাবা সত্ত্ব বিশুদ্ধ হয তখনই দীর্ঘ ধ্যানেব সহাযে সেই অখণ্ড আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকাব কবা যায়।"

আবাব কঠোপনিষদেই বলা হইযাছে,

এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢোত্মা
ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যযা বুদ্ধ্যা
সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥ ১।৩।১২

সর্ব্বভূতেব মধ্যে নিগূঢ় আত্মা প্রকাশমান নহে, সূক্ষ্মদর্শী পুরুষেবা সূক্ষ্ম শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিব সহাযে তাহাকে দর্শন কবেন।

তৈত্তিবীযোপনিষদে বলা হইযাছে,

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। ২।৯

"মনেব সহিত বাক্য যাহাকে না পাইযা ফিবিযা আইসে। সেই ব্রহ্মেব আনন্দ যে লাভ কবিয়াছে তাহাব আব কোন কিছু হইতেই ভয থাকে না।" ইহা হইতে বুঝা যায সাধক ব্রহ্মেব আনন্দ লাভ কবিতে পাবেন বটে কিন্তু মন বুদ্ধিব দ্বাবা নহে। কিন্তু অন্যত্র শ্রুতিতে বলা হইযাছে, ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ কবিতে হইবে, মনন কবিতে হইবে, ধ্যান কবিতে হইবে। যাজ্ঞবল্ক্য গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া যাইবাব সময় তাঁহাব বিষয সম্পত্তি তাঁহাব দুই স্ত্রী মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নীকে ভাগ কবিয়া দিতে চাহিলে, মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি ধনৈশ্বর্য্য পূর্ণ এই সমস্ত পৃথিবী আমাব হয় তাহা হইলে উহা দ্বারা আমি কি অমৃতত্ব লাভ করিতে পাবিব?"

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তব দিলেন, "না, ধন ঐশ্বর্য্য হইতে অমৃতত্ব লাভেব কোন আশা নাই—যেরূপ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন অন্য লোকেব জীবন তোমাব জীবনও সেই-রূপই হইবে।" তখন মৈত্রেয়ী বলিলেন, "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং, যাহা দ্বাবা আমি অমৃতত্ব লাভ কবিতে না পাবিব- তাহা লইয়া আমি কি কবিব? অমৃতত্বেব সাধন আপনি যাহা জানেন আমাকে বলুন।" যাজ্ঞ-বল্ক্য বলিলেন, "হে মৈত্রেয়ি! তুমি পূর্ব্ব হইতেই আমাব প্রিয়া আছ, এখন আমাব প্রীতিকব কথাই বলিলে। এস, নিকটে উপবেশন কব, আমি অমৃতত্ব-লাভেব উপায় ব্যাখ্যা কবিতেছি, তুমি আমাব বাক্য সকল নিদিধ্যাসন কব অর্থাৎ আমি যাহা বলি তাহা তুমি একাগ্রমনে তাৎপর্য্যাবধাবণ কবিয়া ভাবিতে চেষ্টা কব।"

তাহাব পব যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, 'পতি পতিব জন্য প্রিয নহে, আত্মাব জন্যই প্রিয, সংসাবেব কোন জিনিষই সে জিনিষেব জন্য প্রিয় হয না, আত্মাব জন্যই প্রিয হয—অতএব হে মৈত্রেয়ি! এই আত্মাই দর্শনীয, শ্রবণীয, মননীয, একাগ্রভাবে ধ্যেয। এই আত্মাবই দর্শন, শ্রবণ, মনন এবং বিজ্ঞানেব দ্বাবা এই জগতেব সব কিছু পবিজ্ঞাত হওয়া যায। (বৃ ২।৪।৫)

একস্থানে বলা হইল আত্মা বাক্য ও মনেব অগোচব, অন্য স্থানে বলা হইল আত্মতত্ত্ব শ্রবণ কবিতে হয, মনন কবিতে হয। এখানে বিবোধ বহিযাছে বলিযা মনে হয বটে, কিন্তু শ্রুতিবাক্যেব প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ কবিলে এই আপাতদৃষ্ট বিবোধেব সমাধান হয। আত্মা দ্বাবাই আত্মাকে দর্শন কবা যায, উপলব্ধি কবা যায, গীতা বলিযাছে আত্মনা আত্মানং পশ্যন্ (৬।২০)। বৃহদাবণ্যক উপনিষদও অন্যত্র বলিযাছে, শান্তো দান্ত উপবতস্তিতিক্ষুঃ সমা-হিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি (৪।৪।২৩)। ইহাই হইতেছে আত্মাব সাক্ষাৎকাব—কিন্তু তাহাব পূর্ব্বে বুদ্ধি দ্বাবাই আত্মতত্ত্ব ধাবণা কবিতে হয়।

তমেব ধীবো বিজ্ঞায প্রজ্ঞাং কুর্বতি—বৃ ৪।৪।২১

বুদ্ধিমান ব্যক্তি ব্রহ্মকে গুরুবাক্য ও শাস্ত্র হইতে জানিযা পরে শম, দম, উপবতি, তিতিক্ষা, সমাধি এই সব সাধনাব দ্বাবা ব্রহ্মকে সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি কবিবেন। মার্জিত ও সুক্ষ্ম বুদ্ধিব সহায়ে ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দরূপে অবধাবণ করা যায, পবে একাগ্র ধ্যান সমাধিব দ্বাবা সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্মস্বরূপ হওয়া যায। এই জন্যই গীতা ব্রহ্মেব আনন্দকে বলিয়াছে বুদ্ধিগ্রাহ্য—বস্তুতঃ আত্মাই যেমন আত্মাকে জানে, তেমনই আত্মাই আত্মার আনন্দ উপভোগ করিতে পাবে—সে পরম আনন্দ বদ্ধিব অতীত। সাক্ষাৎভাবে

সে আনন্দ লাভ করিতে হইলে মন বুদ্ধির সকল তর্ক বিচারকে নিস্তব্ধ করিতে হয়। কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি
তামাহুঃ পরমাং গতিম।
তাং যোগমিতি মন্যতে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণা। ২।৩।১০।১১

অর্থাৎ যে-সময়ে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত আত্মায় স্থির হয় আর বুদ্ধিও নিশ্চেষ্ট হয় সেই অবস্থাকেই পরমাগতি বলা যায়—এবং তাহাই যোগ। কিন্তু এই যোগ সাধনের জন্য মন বুদ্ধির দ্বারাই আত্মতত্ত্ব গ্রহণ করিতে হয়,

মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। কঠ ২।১।১১

'এই অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব মনের দ্বারাই প্রাপ্ত হইতে হয়। মুণ্ডকোপনিষদেও বলা হইয়াছে, বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ। বস্তুত বুদ্ধি যদি ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন পরিচয়ই দিতে না পারে তাহা হইলে সকল দর্শনশাস্ত্রই ব্যর্থ হইয়া যায়, কারণ দর্শন শাস্ত্রের লক্ষ্যই হইতেছে যুক্তির দ্বারা মনের কাছে পরম তত্ত্ব-সকল পরিস্ফুট করা। মন এই ভাবে তৃপ্ত হইলে যোগসাধনার পথে অগ্রসর হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। সমস্ত গীতাটিই হইতেছে বুদ্ধির সাহায্যে আত্মতত্ত্ব পরিস্ফুট করা, বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছঃ।* বুদ্ধির ঊর্দ্ধে যে পুরুষ, আত্মা, তাহাই আমাদের মূল সত্তা একাগ্র বুদ্ধির দ্বারা তাহাকে বুঝিতে হইবে জানিতে হইবে, সেই আত্মাতেই আমাদের প্রাণ মন বুদ্ধিকে দৃঢ় স লগ্ন করিতে হইবে, ইহাই বুদ্ধিযোগ—এই যোগের দ্বারাই আমরা আত্মাকে লাভ করিয়া সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইব,

বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি। ২।৩৯

সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের বিষয় নহে ইন্দ্রিয় শুধু জড় বাহ্য জগতেরই পরিচয় দেয়। মানুষের মন যতক্ষণ এই জড়ের অনুগত—জড়ের অতীত যে কোন সত্য আছে তাহা ধারণা করিতে পারে না—ততক্ষণ তাহার নিকট আত্মতত্ত্ব ভগবৎ তত্ত্ব অধিগম্য নহে—সে তত্ত্ব লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষকে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে, জড়ানুগত মনের গণ্ডী ভেদ করিতে হইবে। আমাদের কতকগুলি শক্তি আছে যাহার সাহায্যে আমরা অতীন্দ্রিয় বিষয়ের ধারণা লাভ করিতে পারি অমিশ্র বুদ্ধি হইতেছে তাহাদের মধ্যে প্রথম। মানুষের বুদ্ধির (Reason) দুই রকম ক্রিয়া আছে—মিশ্র ও অমিশ্র, স্বাধীন ও সাপেক্ষ। বুদ্ধির মিশ্র বা সাপেক্ষ ক্রিয়া তখনই

* তাই গীতাকে ব্রহ্মবিদ্যা বলা হইয়াছে।

অন্বয়। যং লব্ধ্বা (যোগী) অপরং লাভং ততঃ অধিকং ন মন্যতে, যস্মিন স্থিতঃ গুরুণা দুঃখেন অপি ন বিচাল্যতে। ২২

তং দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ; অনির্ব্বিণ্নচেতসা নিশ্চয়েন সঃ যোগঃ যোক্তব্যঃ। ২৩

অনুবাদ। যাহা লাভ করিলে অন্য সকল লাভ অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে ভীষণ দুঃখও মানুষকে বিচলিত করিতে পারে না, যোগ বলিতে দুঃখসংযোগের বিয়োগরূপ সেই অবস্থাই বুঝায়; (অতএব) সেই যোগ নির্ব্বেদশূন্য চিত্তে অধ্যবসায় সহকারে অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

ব্যাখ্যা

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং। যোগসাধনা কি সে সম্বন্ধে লোকের মনে নানা ভ্রান্ত ও অস্পষ্ট ধারণা আছে, সেজন্য লোকে যোগসাধনা করিতে সাহস বা উৎসাহ পায় না, গীতা তাই কয়েকটি শ্লোকে যোগ কাহাকে বলে তাহার সার মর্ম্মটি বুঝাইয়া দিতেছে। সংসারী লোক নানারকম লাভ চায়, ধন চায়, পুত্র চায়, যশমান প্রতিষ্ঠা চায়—গীতা বলিতেছে, যোগের দ্বারা যে পরম অধ্যাত্ম আনন্দ লাভ করা যায় তাহার তুলনায় অন্য সকল লাভই অতি তুচ্ছ, নগণ্য। সংসারী লোক দুঃখকে ভয় করে, দুঃখের আঘাতে কাতর হইয়া উঠে—কিন্তু যিনি যোগে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন সংসারের কোন গুরু দুঃখই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না, তাঁহার অখণ্ড আনন্দকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না। মানুষের অন্তরাত্মা বাস্তবিক যাহা চায়, নিরতিশয় সুখ ও আনন্দ এবং সকল দুঃখের আক্রমণ হইতে মুক্তি, একমাত্র যোগসাধনার দ্বারাই তাহা লাভ করা যাইতে পারে। অতএব দৃঢ়সঙ্কল্পের সহিত অবসাদশূন্য হইয়া যোগসাধনা করা কর্ত্তব্য; যতক্ষণ না যোগের এই পরম আনন্দ নিশ্চিত ভাবে লাভ করা যাইতেছে ততক্ষণ কিছুতেই সাধন-পন্থা হইতে বিচলিত হইতে নাই, নিরুৎসাহ হইতে নাই।

"যং" বলিতে এই শ্লোকে ঠিক কি বুঝাইতেছে তাহা লইয়া ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে মতভেদ আছে। শঙ্কর বলিয়াছেন, আত্মলাভ শ্রীধর বলিয়াছেন, আত্মসুখলাভ। পরের শ্লোকেই গীতা "তং" শব্দের দ্বারা যোগ বুঝিয়াছে, অতএব এখানেও "যং" শব্দের দ্বারা তাহাই বুঝিতে হইবে। যে আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হইলে দুঃখের সহিত চিরবিচ্ছেদ হয় তাহা লাভ করাই যোগ, আর তাহা হইতেছে মূলতঃ ভগবানের সহিত মিলন, যদিও নানা লক্ষণের দ্বারা এই যোগ অবস্থার পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। আত্মলাভ

এবং আত্মসুখলাভ একই কথা—একই অনুভূতির দুইটি দিক মাত্র এবং ইহাই যোগের স্বরূপ।

মন্যতে নাধিকং ততঃ। কেহ কেহ বলিযাছেন যে গীতা এখানে যোগ বলিতে পাতঞ্জলের যোগলব্ধ সমাধি ও কৈবল্যের অবস্থাই বুঝিযাছে। প্রকৃতির সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিযা যোগী যখন শুদ্ধ পুরুষ-চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত তখনই হয রাজযোগের সিদ্ধাবস্থা। সে অবস্থায প্রকৃতির খেলা থাকে না, চিত্তবৃত্তি সকল নিরুদ্ধ হয মনবুদ্ধি লোপ পায। গীতা যে এইরূপ যোগের কথা বলিতেছে না এখানে 'মন্যতে' কথাটির দ্বারাই তাহা পরিস্ফুট হইযাছে। এই অধ্যাযেরই ১৮ শ্লোকে বলা হইযাছে চিত্ত যখন সকল কামনা হইতে শূন্য সকল বিক্ষেপ হইতে নিবৃত্ত ও সংযত হইযা আত্মায স্বপ্রতিষ্ঠিত হয তখনই হয যোগ—এখানে চিত্ত বা মনের লযের কোন কথা নাই। আছে মনকে বাসনা-শূন্য করা এবং ভগবানে বা আত্মায একাগ্র করা।

কেহ কেহ ব্যাখ্যা করিযাছেন যে, সমাধি অবস্থায যখন যোগানন্দ অনুভব করা যায তখন মনের কোন ক্রিয়া থাকে না—সমাধি ভঙ্গ হইলে যোগী তখনকার সেই আনন্দের সহিত অন্য আনন্দের তুলনা করিযা দেখেন যে সে সবই তুচ্ছ। কিন্তু ইহা কষ্টকল্পনা—যিনি সুনিশ্চিতভাবে যোগে প্রতিষ্ঠিত হইযাছেন তিনি আর কখনও সে আনন্দ হইতে বিচ্যুত হন না মনের ক্রিয়া হইলেও সে আনন্দ ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না।

ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে। গুরুদুঃখের দৃষ্টান্তস্বরূপ রামানুজ বলিযাছেন, গুণবান পুত্রের মৃত্যু ইত্যাদি। কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যা করিলে বলিতে হয যে, সংসারী লোকই যোগী হন—সংসারে থাকিযাও তাহারা পুত্রশোকাদি গুরুদুঃখে বিচলিত হন না। শঙ্কর স্বীকার করেন না যে সংসারে থাকিযা, পুত্র-পরিজন পরিবৃত থাকিযা কেহ যোগসাধনা করিতে পারে—মঠ, অরণ্য বা পর্ব্বতগুহাই যোগসাধনার স্থান। সেখানে সাধকের গুরুদুঃখের কি কারণ হইতে পারে? যদি কোনরকমে কোন শস্ত্রের আঘাত হয শস্ত্রনিপাতাদি। শ্রীধর বলিযাছেন, মহতাঽপি শীতোষ্ণাদি দুঃখেন। পরিব্রাজক বলিযাছেন এই আত্মসংস্থিতি-কালে শীত, আতপ, বাযু, মশক দংশনাদির উপদ্রব যোগীকে অনুভব করিতে হয় না।" কিন্তু গীতার অর্থ এরূপ সঙ্কীর্ণ বলিযা মনে হয না যে, কেবল যাহারা সংসার ত্যাগ করিযা সন্ন্যাসী হইবে তাহারাই এই দুঃখলেশশূন্য পরম আনন্দময় অবস্থা লাভ করিবে, এবং তাহারাও কেবল সমাধির সময়েই এইরূপ অবস্থায প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। সমস্ত গীতা-শিক্ষার মর্ম্মই হইতেছে যে, সাংসারিক

জীবন ও কর্ম্মের সহিত যোগসাধনার কোনও বিরোধ নাই ; যোগসাধনা অন্তরের জিনিষ, যুদ্ধের ন্যায় ভীষণ কর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও তাহা করা চলে, মুক্ত যোগীপুরুষেরাও সকল প্রকার কর্ম্ম করিতে পারেন, এবং তাহা করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা যে কেবল বাহ্যজ্ঞানশূন্যাবস্থাতেই সকল দুঃখের অতীত হন তাহা নহে—জাগ্রত অবস্থাতেও তাঁহারা কোন গুরু দুঃখে বিচলিত হন না, যুদ্ধ-ক্ষেত্রে শস্ত্রাঘাতেও নহে, আর গার্হস্থ্যজীবনে পুত্রাদি প্রিয়জন বিয়োগেও নহে। তবে আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি গীতা যে-ভাবে যোগসাধনা করিতে বলিয়াছে, সর্ব্ববিধ বাসনা ও আসক্তি হইতে মুক্ত হইতে বলিয়াছে—তাহা সাধারণ সাংসারিক পরিস্থিতির মধ্যে থাকিয়া সম্পূর্ণ করা সম্ভব নহে—সাময়িক ভাবে এই সাংসারিক জীবন হইতে সরিয়া যাওয়া যোগসাধনার পক্ষে প্রয়োজনীয় হইতে পারে। সিদ্ধিলাভের পর যোগী যেখানেই থাকুন, আর যাহাই করুন, আভ্যন্তরীণ শান্তি ও আনন্দ হইতে তিনি কখনও বিচ্যুত হন না। "ন বিচাল্যতে" হইতেই বুঝা যায় দুঃখ বা দুঃখের কারণ তাহার নিকট যে আসে না তাহা নহে, তবে তিনি তাহাতে বিচলিত হন না—কারণ বাহ্যচৈতন্যের দুঃখের সহিত তাঁহার আভ্যন্তর চৈতন্যের সকল সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। শস্ত্রনিপাতের দুঃখই হউক আর পুত্রবিয়োগের দুঃখই হউক সে-সবই হইতেছে মনের, এ দুঃখ বাহির হইতে আইসে, বাহিরের বস্তু বা ঘটনার স্পর্শে আমাদের মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয় যে প্রতিক্রিয়া করে তাহাই বাহ্য সুখ দুঃখ রূপে অনুভূত হয়। যোগী ভিতরে যে শান্তি ও আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হন, তাহাতে বাহিরের মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়ও শান্ত হইয়া যায়, তাহারাও আর বাহ্যসংস্পর্শে বিচলিত বা প্রতিক্রিয়াশীল হয় না।

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং।

"যত্রোপরমতে" ইত্যাদি শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া এই শ্লোক পর্য্যন্ত যাবদ্ বিশেষণের দ্বারা যে অধ্যাত্ম অবস্থা বুঝান হইয়াছে, যাহাতে দুঃখ সংযোগের বিয়োগ হয় তাহাই "যোগ" বলিয়া কথিত হইয়াছে জানিবে। গীতা এখানে পাতঞ্জল দর্শনোক্ত যোগের সংজ্ঞাই উল্লেখ করিয়াছে। পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্যকার ব্যাস বলিয়াছেন—"যেমন চিকিৎসাশাস্ত্রে রোগ, রোগহেতু, আরোগ্য এবং আরোগ্যের ভৈষজ্য বা ঔষধ এই চারি অধ্যায়ে বিভক্ত, তদ্রূপ যোগশাস্ত্রও চারি অধ্যায়ে বিভক্ত—সংসার, সংসারের হেতু, মোক্ষ ও মোক্ষের উপায়। তাহার মধ্যে দুঃখবহুল সংসার হেয় অর্থাৎ পরিত্যাগের যোগ্য ; হেয় সংসারের হেতু প্রধান (প্রকৃতি) ও পুরুষের সংযোগ ; উক্ত সংযোগ বা তৎকার্য্য দুঃখবহুল সংসারের আত্যন্তিক (পুনর্ব্বার না হয় এরূপ) নিবৃত্তির

নাম হান, হানের উপায় সম্যক দর্শন অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান।"
পাতঞ্জল দর্শনে বলা হইয়াছে,

দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ। (২।১৭)

দুঃখই হেয় অর্থাৎ পরিত্যাগের যোগ্য,—জন্মমরণসঙ্কুল সংসার হইতেছে দুঃখময়, অতএব সংসারই হেয় এবং এই হেয়-সংসারের হেতু হইতেছে দ্রষ্টা বা পুরুষের সহিত দৃশ্য বা প্রকৃতির সংযোগ। এই বিশ্বসংসার প্রকৃতিতে অব্যক্তাবস্থায় থাকে পুরুষের সহিত সংযোগ হইলেই, প্রকৃতি হইতে সংসারের বিকাশ হয় তাই এই সংযোগকেই হেয়-হেতু বলা হইয়াছে, এবং এই সংযোগের অভাবকেই হান বলা হইয়াছে তাহা হইতেই সকল দুঃখের চির-নিবৃত্তি হয়।

পুরুষ ও প্রকৃতির যে সংযোগ তাহার স্বরূপ কি? সংযোগ দৈশিক হইতে পারে অথবা কালিক হইতে পারে—যেমন বৃক্ষে পক্ষী বসিয়া রহিয়াছে ইহা হইল দেশগত বা দৈশিক সংযোগ। আর আমি একটি সুসংবাদ শুনিলাম তাহার পরক্ষণেই আমার মনে সুখের উদ্ভব হইল—এখানে সংবাদ শুনা ও সুখবোধ এই দুইটির মধ্যে সংযোগ রহিয়াছে—কিন্তু তাহা দেশগত নহে চিত্তক্রিয়াসকল দেশে অবস্থিত নহে, তাহারা পর্য্যায়ক্রমে চলিতেছে, এই পর্য্যায়কেই আমরা কাল বলিয়া জানি—অতএব এই ক্ষেত্রে সংযোগ হইতেছে কালিক সংযোগ। বাহ্যবস্তুসকলের সংযোগ দৈশিক, এবং অভ্যন্তর ক্রিয়া-সকলের সংযোগ কালিক—তাহারা একের পর একটি এইরূপ ক্রমান্বয়ে স্রোতের মত চলে, এই স্রোতকেই কালস্রোত বলা হয়। দেশ ও কাল প্রকৃত-পক্ষে বাস্তব পদার্থ নহে, উহারা হইতেছে এক প্রকার জ্ঞান। বুদ্ধির দ্বারা বিষয়সকলকে জানিতে বা অনুভব করিতে হইলে দেশ ও কালের মধ্যেই তাহাদের অবধারণ করিতে হয়। পাশ্চাত্য দার্শনিক ক্যান্ট দেশ ও কালকে বলিয়াছেন categories of the understanding, ইহারা বাহিরে নাই, বুদ্ধিরই অন্তর্নিহিত—বুদ্ধি বিষয়ের সংস্পর্শে আসিলেই দেশ ও কালের জ্ঞানের মধ্যে সাজাইয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করে। অতএব বুদ্ধি হইতেছে দেশ ও কালের অতীত। পুরুষের চেতনায় উদ্ভাসিত হইয়াই বুদ্ধি চেতনবৎ হয়। অতএব পুরুষও দেশ ও কালের অতীত এবং পুরুষ ও বুদ্ধির, পুরুষ ও প্রকৃতির সে সংযোগ তাহা দৈশিক বা কালিক নহে, তাহা অ-দেশকালিক। তবে তাহার স্বরূপ কি? দ্রষ্টা ও দৃশ্য পৃথক, পুরুষ ও প্রকৃতি পৃথক, তাহাদিগকে যে ভ্রান্তি বশে এক বলিয়া মনে করা হয় তাহাকেই "সংযোগ" বলা হইয়াছে। অতএব সংযোগ এখানে হইতেছে ভ্রান্ত জ্ঞান, ইহা চৈতন্যেরই একটি ক্রিয়া।

প্রকৃতি অব্যক্ত, পুরুষ তাহাকে ভোগ করে, দর্শন করে বলিযাই তাহা ব্যক্ত হয়—প্রকৃতি পুরুষের ভোগ্য হইবার যোগ্য—এবং পুরুষ প্রকৃতির ভোক্তা হইবার যোগ্য—এই জন্যই পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধকে "সংযোগ" শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হইযাছে। পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ পাশাপাশি বা এককালে অবস্থান নহে। পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েই দেশকালাতীত বলিয়া তাহাদের সংযোগ "ভেদ লক্ষ্য না হওয়া" রূপ অ-দেশকালিক। দ্রষ্টা ও দৃশ্য পৃথক সত্তা, অতএব তাহাদিগকে অপৃথক বলিযা মনে করা বিপর্য্যয জ্ঞান, ভ্রান্ত জ্ঞান, সুতরাং অবিদ্যাই এই সংযোগের মূল সূত্র,

তস্য হেতুরবিদ্যা—পা সূ ২।২৪

—পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগের হেতু অবিদ্যা।

তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং
তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্—পা সূ ২।২৫

দুঃখ হইতেছে হেয বা পরিত্যাজ্য এবং সংযোগ হইতেছে হেয-কারণ, আর সেই সংযোগের কারণ হইতেছে অবিদ্যা। অতঃ-পর "হান" কি তাহাই এই সূত্রে বলা হইযাছে, "তাহার (অবিদ্যার) অভাব হইতে যে সংযোগাভাব তাহাই হান, আর তাহাই দ্রষ্টার কৈবল্য।" দুঃখকারণনিবৃত্তি হইলে যে দুঃখনিবৃত্তি তাহাই হান। সে অবস্থায পুরুষ স্বরূপপ্রতিষ্ঠিত থাকেন। দ্রষ্টার কৈবল্য অর্থে কেবল দ্রষ্টা থাকেন। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ থাকিলে কেবল দ্রষ্টা আছেন বলা যায না। প্রকৃতির সহিত সংযোগের জন্য প্রকৃতির ত্রিগুণের খেলা পুরুষেরই বলিযা মনে হয—সুখ দুঃখ ঐ ত্রিগুণেরই ধর্ম্ম, অতএব মনে হয পুরুষই সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে। কৈবল্যাবস্থায পুরুষের সম্মুখে আর প্রকৃতির ত্রিগুণের খেলা নাই, পুরুষের সুখদুঃখও নাই—ইহাকেই পুরুষের মুক্তাবস্থা বলা হয, এবং ইহাই সকল প্রাচীন অধ্যাত্ম সাধনার লক্ষ্য।

দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার পন্থা হিসাবে এই সাধনা যে উপযোগী তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিন্তু এখানে অনেক প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকিযা যায়; যোগ-সাধনার দিক হইতে ইহা কার্য্যতঃ ফলপ্রদ হইলেও, দর্শনশাস্ত্রের দিক হইতে ইহা অপূর্ণ ও অসন্তোষজনক। প্রথমেই প্রশ্ন উঠে, অবিদ্যা বা ভ্রান্তি জ্ঞান ত বুদ্ধিরই, পুরুষের মধ্যে ভ্রান্তিজ্ঞান নাই—এমন কি কোন জ্ঞানই নাই, পুরুষ চৈতন্য মাত্র—কিন্তু যতক্ষণ না তাহার সম্মুখে কোন দৃশ্য আসিতেছে ততক্ষণ সে জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা হয় না—আপনার চৈতন্যে আপনি প্রতিষ্ঠিত থাকে।

প্রকৃতি পুরুষের সম্মুখে আসিলেই বুদ্ধির বিকাশ হয়, তাহার পর ত বুদ্ধির অবিদ্যার ক্রিয়া হইতে পাবে, এবং অবিদ্যা হইতে "সংযোগ" হইতে পারে অর্থাৎ মনে হইতে পারে যে পুরুষ ও প্রকৃতি এক, পুরুষই প্রকৃতিস্থ সুখদুঃখেব ভোক্তা। কিন্তু তাহাব পূর্ব্বে প্রকৃতি কেমন কবিয়া পুরুষকে প্রভাবিত কবে? অতএব ইহা স্পষ্ট যে, পুরুষ ও প্রকৃতিব যে সম্বন্ধ, যাহাব ফলে মনে হয যে পুরুষ প্রকৃতি যেন এক তাহা বুদ্ধি বা অবিদ্যাব ক্রিয়া হইতে পাবে না। সাংখ্যদর্শন এই প্রশ্নেব উত্তব দিযাছে,

তৎসন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ। ১।৯৬

এই সূত্রটিব দুইবকম ব্যাখ্যা আছে। পুরুষেব অধিষ্ঠাতৃত্বেই প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি কবে ইহা স্বীকার্য্য, কিন্তু সেই অধিষ্ঠান সান্নিধ্য মাত্র বোধক, যেমন অযস্কান্ত মণি অর্থাৎ চুম্বক পাথবেব সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইযা লৌহ অয়স্কান্ত মণির ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয এবং অপব লৌহকে আকর্ষণ কবিতে পাবে সেইরূপ পুরুষেব মাত্র সান্নিধ্য হেতু প্রকৃতি চেতন-স্বভাব প্রাপ্ত হইযা মহদাদিব সৃষ্টি-সামর্থ্য লাভ কবে। "মণিবৎ" শব্দেব অন্য প্রকাব অর্থ বিজ্ঞান-ভিক্ষু কবিয়াছেন, যথা —অযস্কান্ত মণিব সান্নিধ্যে যেমন কোন স্থানে বিদ্ধ শৈল্য (লৌহময কাঁটা) আপনা হইতেই নির্গত হয, সান্নিধ্যে অবস্থিতি ভিন্ন অযস্কান্ত মণিব অন্য কোন প্রকাব চেষ্টা তাহাতে থাকে না, তদ্রূপ পুরুষেব সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতি চৈতন্যময হইযা সৃষ্টি-শক্তিশালিনী হয। 'মণিবৎ" শব্দের এই উভয়প্রকাব ব্যাখ্যাব একই ফল—পুরুষ কিছুই কবে না নিজে পরিণত বা পবিবর্ত্তিত হয় না, কিন্তু তাহাব সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতিই ক্রিযাশীলা হইয়া প্রসব কবে। কিন্তু এই সান্নিধ্য চুম্বক ও লৌহেব ন্যায দৈশিক হইতে পাবে না অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি পবস্পবেব নিকটবর্ত্তী স্থানে রহিযাছে এইরূপ হইতে পাবে না কাবণ উভয়েই দেশ ও কালেব অতীত। তাহা হইলে এ সান্নিধ্যেব স্বরূপ কি? আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি দ্রষ্টা ও দৃশ্যেব সংযোগ হইতেছে একটি জ্ঞানক্রিয়া, "আমি জ্ঞাতা, ভোক্তা" এইরূপ জ্ঞান, তাহা বিপর্য্যয় জ্ঞান বা অবিদ্যা। সেইরূপ এই সান্নিধ্য যখন অ-দেশকালিক তখন ইহাও একটি চৈতনের ক্রিয়া, জ্ঞানেব ক্রিয়া ভিন্ন আব কিছুই হইতে পাবে না। আব এই জ্ঞান ক্রিয়া প্রকৃতির হইতে পাবে না, কাবণ যতক্ষণ না পুরুষেব সান্নিধ্য হইতেছে ততক্ষণ প্রকৃতিব মধ্যে কোনরূপ জ্ঞান বা চেতনাব উন্মেষ হয় না। অতএব এ চেতন-ক্রিয়া পুরুষেবই, পুরুষই প্রকৃতিকে নিজ হইতে পৃথক করিয়া দেখে, নিজের সম্মুখবর্ত্তী, নিকটবর্ত্তী বলিয়া দেখে। আব পুরুষ নিজেকেই দেখিতে পারে, অপরকে নহে—অতএব প্রকৃতি পুরুষ হইতে কোন স্বতন্ত্র তত্ত্ব হইতে পারে না—প্রকৃতি

পুরুষের নিজেরই শক্তি—তাহারই মধ্যে লীন থাকে, পুরুষ জগৎ সৃষ্টির সঙ্কল্প করিলে প্রকৃতিকে নিজ সত্তা হইতে যেন পৃথক করিয়া তাহার অধ্যক্ষ ও অধিষ্ঠাতা হইয়া তাহার দ্বারা জগৎ প্রপঞ্চ সৃষ্টি করে। ইহাই আদি বেদান্ত মত—গীতায় আমরা প্রকৃতি ও পুরুষের এই সম্বন্ধই দেখিতে পাই। গীতা প্রকৃতিকে পুরুষেরই প্রকৃতি বলিয়াছে, কোন স্বতন্ত্র তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করে নাই। গীতার মতে পুরুষ শুধু নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টা মাত্র নহে, পরন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা, তাই গীতা পুরুষকে কেবলমাত্র অধিষ্ঠাতা না বলিয়া অধ্যক্ষ বলিয়াছে (৯।৮-১০)। কিন্তু সাংখ্য এই বেদান্তমত গ্রহণ করে নাই—পুরুষ চেতন, প্রকৃতি জড—প্রকৃতি কখনও পুরুষের সহিত এক হইতে পারে না, পুরুষের সত্তা বা শক্তি হইতে পারে না। তবে সাংখ্যকে প্রকৃতির অতিরিক্ত পুরুষ স্বীকার করিতে হইয়াছে, কারণ প্রকৃতির মধ্যে বুদ্ধির বিকাশ হইতেছে, চৈতন্যের বিকাশ হইতেছে, প্রকৃতির সৃষ্ট জগতে যে শৃঙ্খলা দেখা যায় ইহা চেতন বুদ্ধি ভিন্ন জড বস্তুর দ্বারা সম্ভব হয় না। প্রকৃতির মধ্যে চৈতন্যের এই ক্রিয়ার ব্যাখ্যা করিতেই সাংখ্য পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছে—পুরুষের আর কোন কাজ নাই, সে শুধু প্রকৃতিকে চৈতন্যময়ী করে—এবং ইহাতেও পুরুষের কোন ক্রিয়া নাই—অগ্নির নিকটে লৌহ থাকিলে লৌহ যেমন অগ্নিময় হইয়া উঠে এবং অগ্নির ন্যায়ই দাহ করিতে পারে, তেমনিই পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃ প্রকৃতিতে চৈতন্যের আবির্ভাব হয—প্রকৃতিতে যে চৈতন্য তাহা পুরুষের চৈতন্যেরই প্রতিচ্ছায়া। আর এই ভাবে চেতনাযুক্ত হইয়া প্রকৃতি যে-সব কর্ম্ম করে, পুরুষের চৈতন্যে সে-সব প্রতিফলিত হয়, পুরুষ সে-সব দর্শন করে—ইহাই পুরুষের ভোগ। সুখদুঃখ প্রকৃতির ধর্ম্ম, পুরুষের নহে—কিন্তু পুরুষের চৈতন্যে তাহারা প্রতিফলিত হওয়ায় পুরুষ সে-সবকে নিজের বলিয়াই মনে করে। সুখদুঃখআদি চিত্তবৃত্তি পুরুষের না হইলেও পুরুষ যে সে-সবকে নিজের বলিয়া মনে করে—ইহাই অবিদ্যা, মূল অজ্ঞান।

এই অবিদ্যা কোথা হইতে আসিল? পুরুষ ও প্রকৃতি কেমন করিয়া সন্নিকটবর্ত্তী হয়? সাংখ্য এই সব প্রশ্নের কোন জবাব দেয় নাই, জবাব দেওয়া প্রয়োজনও মনে করে নাই। সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন, প্রকৃতি কখনও পুরুষ হইতে দূরে ছিল, কোন সময়ে পরস্পর পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে—এইরূপ ধারণা করা ঠিক নহে—পুরুষের সহিত প্রকৃতির সান্নিধ্য অনাদি, এবং এই সান্নিধ্য হইতে যে চিত্তবৃত্তির বিকাশ হয, অবিদ্যার ক্রিয়া হয় ইহারাও অনাদি। তবে অনাদি হইলেও ইহারা অনন্ত নহে। পুরুষ প্রকৃতির ভেদজ্ঞান হইতে অবিদ্যার নাশ হয়, অবিদ্যার নাশ হইলে সংযোগের

নাশ হয়—পুরুষ কৈবল্য লাভ করে। সাক্ষাৎ ভাবে যখন দেখা যাইতেছে যে অবিদ্যার নাশ হয় এবং অবিদ্যার নাশ হইলেই দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ বিদূরিত হয়—তখন অবিদ্যাকেই দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগের কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। অবিদ্যা অর্থে বিপর্য্যয় জ্ঞান—বাসনা।* বিপর্য্যয় বা মিথ্যাজ্ঞান অনাত্মে আত্মজ্ঞান (প্রকৃতিতে পুরুষজ্ঞান) অবিদ্যার লক্ষণ। সামান্যতঃ বুদ্ধি ও পুরুষের অভেদজ্ঞানই বন্ধকারণ বিপর্য্যয়জ্ঞান। আমরা যাহাকে "আমি" বলি সেটি বস্তুতঃ পুরুষ নহে তাহা বুদ্ধিরই একটি বৃত্তি—উহা বুদ্ধিতে পুরুষের প্রতিচ্ছায়া—ইহাকেই পুরুষ বলিয়া ভ্রম হয়—তাই বুদ্ধিতে সুখদুঃখআদি যত বৃত্তির উদয় সে-সবই পুরুষের বলিয়া ভ্রম হয়, ইহাকেই যোগসূত্রে বলা হইয়াছে, বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র। বুদ্ধির সকল বৃত্তি যখন নিরুদ্ধ হয় তখন আর এই ভ্রমের কোন সম্ভাবনা থাকে না—পুরুষ স্বরূপে অবস্থান করে—তাই চিত্তবৃত্তিনিরোধকে পুরুষের কৈবল্যলাভের উপায়স্বরূপ যোগ নামে অভিহিত করা হইয়াছে—

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। ১।২
তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্॥ ১।৩
বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র। ১।৪

এই অবিদ্যা বা মিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে কপিলাশ্রমীয় যোগদর্শনে বলা হইয়াছে, "অবিদ্যাই মূলতঃ সংযোগের কারণ। সংযোগ অনাদি, সুতরাং এমন কাল ছিল না, যখন সংযোগ ছিল না। অতএব সংযোগের আদি প্রবৃত্তি দেখিয়া তাহার কারণ নির্ণেয় নহে। কিন্তু বিয়োগ দেখিয়াই সংযোগের কারণ নির্ণয়। একটু খনিজ মনঃশিলা পাইলাম, তাহার উৎপত্তি দেখি নাই, কিন্তু তাহাকে বিশ্লেষ করিয়া জানিলাম যে, তাহা গন্ধক ও শঙ্খধাতু (আর্সেনিক)। সংযোগ-সম্বন্ধও সেইরূপ। বিবেকজ্ঞান হইলে বুদ্ধি সম্যক নিরুদ্ধ হয় বা বুদ্ধি পুরুষের বিয়োগ হয়, অতএব বিবেকজ্ঞানের বিরোধী যে অবিবেক বা অবিদ্যা, তাহাই সংযোগের কারণ। ভাষ্যকার এইরূপই দেখাইয়াছেন। বিপর্যয়-জ্ঞানবাসনা (সংস্কার) যতদিন থাকে, ততদিন বিয়োগ হয় না সম্যক পুরুষখ্যাতি (অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদজ্ঞান) হইলেই চিত্তের কার্য্য শেষ হয় বা বিয়োগ হয়, অতএব পুরুষখ্যাতির বিপরীত যে বিপর্য্যয়-জ্ঞান, তাহাই সংযোগের কারণ। পূর্ব্বসংস্কারকে হেতু করিয়াই বর্ত্তমান

* সাংখ্য দর্শনে বাসনা শব্দের অর্থ সংস্কার। বিপর্য্যয় জ্ঞানের সংস্কার হইতে পুনঃ বিপর্য্যয় জ্ঞানের উদ্ভব হয়—এইভাবে অবিদ্যার প্রবাহ অনাদিকাল হইতে চলিতেছে।

বিপর্য্যয়জ্ঞান উদিত হয। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্রমে সংস্কাব অনাদি। অতএব অনাদি বিপর্য্যয সংস্কার বা অনাদিবিপর্য্যয়জ্ঞান-বাসনাই সংযোগেব হেতু।" (পৃঃ১৫৮)

সাংখ্য ও পাতঞ্জলদর্শন প্রচাবিত মুক্তিলাভেব উপায হইতেছে চিত্তবৃত্তি বা বুদ্ধিবৃত্তি নিবোধ বা নাশ। বুদ্ধির বিবেকের দ্বাবাই এই বিনাশ সম্পাদিত হয়। বিরুদ্ধবাদীবা একটি উপাখ্যানেব দ্বাবা এ-বিষযে উপহাস কবেন বলিয়া ভাষ্যকার ব্যাস উল্লেখ কবিযাছেন। এক নপুংসকেব সবলা নির্ব্বোধ স্ত্রী তাহাকে বলিতেছে, "আর্য্যপুত্র! আমাব ভগিনী অপত্যবতী, কি জন্য আমি নহি?" নপুংসক ভার্য্যাকে বলিল "মবিযা আমি তোমাব পুত্র উৎপাদন করিব।" সেইরূপ এই বিদ্যমান জ্ঞানই যখন চিত্তনিবৃত্তি কবে না, তখন যে তাহা বিনষ্ট হইয়া কবিবে তাহাতে কি প্রত্যাশা আছে? ইহার উত্তবে বলা যায যে, "বুদ্ধি নিবৃত্তিই মোক্ষ, অদর্শনরূপ কাবণ অপগত হইলে বুদ্ধি নিবৃত্তি হয়। সেই বন্ধকাবণ অদর্শন, দর্শন হইতে নিবর্ত্তিত হয।' ফলতঃ চিত্তনিবৃত্তিই মোক্ষ, অতএব উক্ত বিপক্ষবাদীব আপত্তি মতিবিভ্রম মাত্র।

অন্য মতে আত্মজ্ঞানই মোক্ষ। সাংখ্য ও পাতঞ্জলেব মতে জ্ঞান গৌণ উপায—কাবণ যতক্ষণ জ্ঞান আছে ততক্ষণ চিত্তবৃত্তি আছে এবং ততক্ষণ মোক্ষ হইতে পাবে না। জ্ঞানেব দ্বাবা চিত্তবৃত্তিব নিবোধ হইলে পুরুষেব কৈবল্যাবস্থা বা মোক্ষ হয।· "দর্শন" হইতেছে পুরুষ ও বুদ্ধিব ভেদজ্ঞান। "অদর্শন" হইতেছে দর্শন বা পুরুষখ্যাতিব বিপবীত জ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধি ও পুরুষ পৃথক হইলেও তাহাদেব একত্ব দর্শন। দর্শনেব দ্বাবা অদর্শন, বিবেকেব দ্বাবা অবিবেক বিনষ্ট হয। সমাহিত চিত্তে 'বুদ্ধি ও পুরুষ পৃথক" এইরূপ উপলব্ধি হয— অতএব তখন বুদ্ধি পদার্থেব জ্ঞান থাকে, চিত্তবৃত্তিব সম্যক নিবোধ হয় না। অতএব কৈবল্য অবস্থায দর্শন-অদর্শন, বিবেক-অবিবেক কিছুই থাকে না। অবিবেক বিবেকেব দ্বারা নষ্ট হয, তাহা হইলেই চিত্তনিবোধ বা বুদ্ধিনিবৃত্তি হয়। "বিবেক অগ্নিব ন্যায নিজ আশ্রযকে ভস্মীভূত কবে।*"

সাংখ্য ও পাতঞ্জলেব মতে মোক্ষ বা কৈবল্যেব স্বরূপ কি এতক্ষণ তাহাই পবিস্ফুট কবা হইল। ইহাদের মতে সর্ব্ববিধ দুঃখেব অত্যন্ত নিবৃত্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ অর্থাৎ মানবেব পবম শ্রেয়ঃ। যতক্ষণ জীবন ও জন্ম আছে, সংসাব আছে ততক্ষণ দুঃখ থাকিবেই। সংসারে মানুষ যে সুখ ভোগ করে তাহাব সহিতও দুঃখ অপরিহার্য্য ভাবে জড়িত অতএব জ্ঞানীগণ দেখেন সমস্ত সংসাব ও জীবনই দুঃখময়,

---

* এখানে "বিবেক" অর্থে conscience নহে, পরন্তু পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদজ্ঞান।

পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তি-বিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ ॥
—যোগসূত্র ২।১৫

জ্ঞানীদের পক্ষে সবই (বিষয়সুখও) দুঃখকর, কারণ ভোগের পরিণাম ভাল নহে, ক্রমশঃ ভোগবাসনা বর্দ্ধিত হয়, ভোগকালেও বিরোধীর প্রতি বিদ্বেষ হয়, এবং ক্রমশঃই ভোগসংস্কার বৃদ্ধি হইতে থাকে। চিত্তের সুখ দুঃখ মোহ বৃত্তিসকলও পরস্পর বিরোধী, কিছুতেই শান্তি নাই। অতএব সাংখ্য ও পাতঞ্জলের মতে সাংসারিক জীবনের চির-অবসান করাই হইতেছে সকল দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির একমাত্র উপায়। পুরুষ ও বুদ্ধির সংযোগ হইতেই এই সাংসারিক জীবনের উৎপত্তি—ঐ সংযোগ দূর করিলেই সাংসারিক জীবনের সহিত সকল দুঃখের চির-অবসান হইবে।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে সাংখ্য ও পাতঞ্জলের মতে পুরুষ ও বুদ্ধির সংযোগ হইতেছে অনাদি। কিন্তু যাহার আদি নাই, কেমন করিয়া তাহার অন্ত হইবে? কোন বিশেষ কারণে যাহার উদ্ভব হয়—সেই কারণের অভাব হইলেই তাহার নাশ হয়। যাহা কখনও কিছু দ্বারা উদ্ভূত হয় নাই—যাহা অনাদি—তাহা কেমন করিয়া বিনষ্ট হইবে? অথচ কার্য্যতঃ দেখা যায় যে, পুরুষ ও প্রকৃতির যে একত্ব-জ্ঞান তাহার বিনাশ হয় যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা। অতএব অবিদ্যা বা ভ্রম জ্ঞান অনাদি নহে, শাশ্বত সত্য নহে। সৃষ্টির কোন স্তরে কোন প্রয়োজনে ইহার আবির্ভাব হইয়াছে। বস্তুতঃ গীতা জগৎ-সৃষ্টির যে ব্যাখ্যা দিয়াছে তাহাতে ইহার মূলে অবিদ্যা বা অজ্ঞান নাই—স্বয়ং ভগবান নিজ পরাপ্রকৃতির ভিতর দিয়া সৃষ্টি করিতেছেন—সেখানে অজ্ঞান বা অবিদ্যার স্থান কোথায়? অবিদ্যার জন্য যে মানুষ দঃখভোগ করে এবং অবিদ্যার অবসানে যে দুঃখের চির-অবসান হয়—ইহা প্রত্যক্ষ সত্য, কিন্তু অবিদ্যা লোপ পাইলেই সৃষ্টি লোপ পাইবে, জীবন লোপ পাইবে এমন কোন কথা নাই। সেইজন্যই গীতা পুরুষ ও প্রকৃতির বিয়োগ সাধনকেই সাংখ্য ও পাতঞ্জলের ন্যায় যোগ বলিয়া অভিহিত করে নাই পরন্তু বলিয়াছে,

দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।

গীতা চিত্তের বা বুদ্ধির নাশ করাকেই যোগ বলে নাই পরন্তু চিত্তের সহিত দুঃখের সংযোগনাশকেই যোগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে।

সাংখ্য পাতঞ্জল যে বলিয়াছে চিত্তের ক্রিয়ামাত্রই দুঃখময় ইহাও গীতার মত নহে। রজঃ ও তমোগুণকে প্রশমিত করিয়া সত্ত্বগুণের বিকাশ করিলে মানুষ এই সংসারেই সুখময় ও শান্তিময় জীবন যাপন করিতে পারে। তমোগুণকে দমন করিবার জন্য গীতা কর্ম্মযোগের সাধনা করিতে বলিয়াছে এবং

রজঃগুণকে প্রশমিত কবিবার জন্য কামক্রোধকে নির্ম্মূল কবিতে বলিয়াছে। তবে যতক্ষণ মানুষ সত্ত্বগুণেব মধ্যে আছে ততক্ষণ তাহাব পূর্ণ মুক্তি নাই—রজঃ ও তমঃ কিছু অবশিষ্ট থাকিবেই এবং তাহারা যে-কোন সময়ে প্রবল হইয়া সত্ত্বকে অভিভূত কবিতে পারে—তাই গীতা সত্ত্বগুণকে শেষ সোপানরূপে অবলম্বন কবিযা গুণাতীত হইতে বলিযাছে—প্রকৃতিব উর্দ্ধে যে পুরুষ রহিয়াছে তাহাকে জানিতে, তাহাব চৈতন্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে বলিযাছে—গীতাব মতে ইহাই নির্ব্বাণ, ইহাই মুক্তি বা মোক্ষ—

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥৫।২৬

ইহা লক্ষ্য কবিবাব বিষয় যে, গীতাব মতে আত্মজ্ঞানই মুক্তি, পাতঞ্জলেব মতে আত্মজ্ঞানও চরম মোক্ষ নহে, কৈবল্য নহে—যখন আত্মজ্ঞানেব ফলে চিত্তেব বিলয় হইবে তখনই মুক্তি বা কৈবল্য। গীতাও পাতঞ্জলেব মত বলিযাছে এই সংসাব দুঃখময় এবং এই দুঃখেব চিব অবসান কবিতে হইবে। কিন্তু পাতঞ্জল সংসাবেব অবসান কবিযাই দুঃখেব অবসান কবিতে বলিযাছে—দৃক্‌শক্তি (পুরুষ) এবং দর্শনশক্তিব (বুদ্ধি) যে অনাদি সংযোগ তাহাই হেযহেতু অর্থাৎ দুঃখেব কাবণ (যোগসূত্র ২।১৭)। সাংখ্যাচার্য্য পঞ্চশিখ বলিযাছেন,

তৎসংযোগহেতুবিবর্জনাৎ স্যাদযমাত্যন্তিকো দুঃখ প্রতীকাবঃ অর্থাৎ "বুদ্ধিব সহিত সংযোগেব হেতুকে বিসর্জন কবিলে এই আত্যন্তিক দুঃখপ্রতীকাব হয।"

আমরা পূর্ব্বেই দেখিযাছি এখানে সংযোগ" শব্দে দুইটি জিনিষেব যুক্ত হওয়া বুঝায না। আমাদেব বুদ্ধিতে "আমি সুখদুঃখ ভোগ কবিতেছি" এইরূপ জ্ঞান আছে. আব এই "আমি"-কেই আমবা আমাদেব মূল সত্তা বলিয়া মনে কবি, আমাদেব এই জ্ঞান বা বুদ্ধি হইতে পৃথক আমাদেব মধ্যেই যে পুরুষ বা আত্মা আছে তাহাকে আমবা জানি না। পাতঞ্জল এই ভ্রান্তিজ্ঞানকেই পুরুষ ও বুদ্ধিব "সংযোগ" নামে অভিহিত কবিয়াছেন। এই ভ্রান্তিজ্ঞান দূব হইলেই সংযোগ দূব হয এবং তাহা হইতে দুঃখেব সহিত চিববিচ্ছেদ হয। গীতা এই পর্য্যন্ত সাংখ্য ও পাতঞ্জলের বিশ্লেষণ গ্রহণ করিযাছে—দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধির অতীত আমাদের যে আত্মা তাহাকে জানিয়াই সকল দুঃখের প্রতিকার করিতে হইবে। কিন্তু ইহার জন্য চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিয়া সাংসারিক জীবনের অবসান কবিতে হইবে—সাংখ্য ও পাতঞ্জলের এই চরম মতটি গীতা গ্রহণ করে নাই। এই পার্থক্যটি বুঝা বিশেষ প্রয়োজন—কাবণ আজও আমাদের দেশে আধ্যাত্মসাধনা মূলতঃ সাংখ্য পাতঞ্জলের মতানুযায়ী সংসার-

ত্যাগকেই দুঃখপ্রতীকারেব উপায় এবং মানুষেব পবম শ্রেয়ঃ বলিয়া ধবিয়া বহিষাছে, আব গীতাব প্রাচীন ব্যাখ্যাকাবগণ এই সাংখ্যমতানুযাযীই গীতাব ব্যাখ্যা কবিযা বিপর্য্যযেব সৃষ্টি কবিযাছেন।

পাতঞ্জলেব মতে পুরুষ ও প্রকৃতিব পার্থক্যজ্ঞান হইতে অবিদ্যাব নাশ হইলেই প্রকৃতি অব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয, সংসাবিক জীবনেব লোপ হয, পুরুষ কৈবল্য লাভ কবে অর্থাৎ কেবল পরুষই থাকে তাহাব সম্মুখে আব প্রকৃতিব খেলা সংসাব থাকে না

তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্ ॥ যোগসূত্র ২।২৫
তাহাব (অবিদ্যাব) অভাব হইতে যে সংযোগাভাব তাহাই হান, আব তাহাই দ্রষ্টাব কৈবল্য।"

কিন্তু অবিদ্যাব অভাব হইলে পুরুষেব কৈবল্য হইবেই গীতা এ মত গ্রহণ কবে নাই। বস্তুতঃ পাতঞ্জলও এমন কথা বলে নাই যে, আত্মজ্ঞান হইলেই কৈবল্যাবস্থা হয—আত্মজ্ঞানেব ফলে চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে তবেই কৈবল্যাবস্থা হয় এবং ইহাব জন্য ঐকান্তিক ভাবে নিবোধ সমাধি অভ্যাস কবিতে হয—ইহাই পাতঞ্জলেব বাজযোগেব সাব ও চবম কথা। গীতা এইরূপ সম্পূর্ণ চিত্ত-বৃত্তি নিবোধেব পক্ষপাতী নহে—গীতাব মতে আত্মজ্ঞানেব দ্বাবা অবিদ্যাব নাশ হইলেই মানুষ মুক্ত হয—তখনও প্রকৃতিব খেলা চলিতে পাবে, কিন্তু সে-সব আব সেই আত্মজ্ঞানী গুণাতীত যোগীকে স্পর্শ কবিতে, বিচলিত কবিতে পাবে না।

সংসাবে থাকিযা সংসাবেব প্রযোজনীয যাবতীয কর্ম্ম কবিযাও কেমন কবিযা মানুষ সকল শোক দুঃখেব অতীত হইযা থাকিতে পাবে তাহাই গীতাব মূল শিক্ষা। এখন প্রশ্ন উঠে গীতা সাংসাবিক জীবন বজায বাখাব এত পক্ষপাতী কেন? সংসাব যে দুঃখময তাহা গীতাবও স্বীকার্য্য। এই দুঃখময সংসাবে আসিযা যাহারা একান্তভাবে ভগবানেব সহিত যোগসাধনা কবিতে পাবে—তাহাবাই দুঃখেব উর্দ্ধে উঠিতে পাবে। কিন্তু সে সাধনা ত সহজ নহে। কয়জন পাবে? তবে এই দুঃখময় সংসাবেব যাহাতে উচ্ছেদ হয়—সেই পন্থা অবলম্বন কবাই কি অধিকতব সঙ্গত নহে? গীতা এই সমস্যাব কোন আলোচনা করে নাই। গীতা দেখিয়াছে, ভগবানেব ইচ্ছা এই যে, সংসাব চলুক—যাহাতে সংসার না লোপ পায সেজন্য ভগবান নিজে অবতীর্ণ হইয়া লোককে সাংসারিক কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত উৎসাহিত কবেন,

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।

কর্ম্মত্যাগ, সংসারত্যাগ, অতিশয় কঠিন, এমন কি প্রকৃতি-বিরুদ্ধ; ভগবানেরও

ইচ্ছা যে জীব সংসারে থাকিয়া কর্ম্ম করুক, সৃষ্টি বর্দ্ধিত বিকশিত হউক—এতএব এমন ভাবে কর্ম্ম করা, সংসার করা উচিত যাহাতে দুঃখ ও অশান্তির হস্ত হইতে চিরমুক্তি লাভ করা যায—আর তাহারই উপায় হইতেছে যোগসাধনা, ইহাই গীতার শিক্ষা।

আমার মধ্যে যে সুখ দুঃখ, শুভ অশুভ, পাপ পুণ্যের দ্বন্দ্ব চলিতেছে—এ-সব প্রকৃতির ত্রিগুণের খেলা, আমি আমার মূল সত্তায় এই প্রকৃতি হইতে পৃথক, অচল অক্ষর চিরশান্তিময় পুরুষ—এই ভেদজ্ঞানই অধ্যাত্মজীবনের প্রতিষ্ঠা এবং ইহা হইতেই দুঃখের অবসান হয়, সাংখ্য যে বিশ্লেষণ করিয়া ইহা দেখাইয়া দিয়াছে ইহা সকলেরই গ্রাহ্য। তবে সাংখ্য এতদূর বিশ্লেষণ করিয়াই থামিয়াছে—তত্ত্বসকল পৃথক করিয়া দেখাইয়া দিয়াছে, তাই ইহার নাম সাংখ্য, কিন্তু সাংখ্য সমন্বয়ের কোন প্রয়াসই করে নাই, এবং অনেক দার্শনিক প্রশ্নই অমীমাংসিত রাখিয়াছে। গীতা বৈদান্তিক ভিত্তিতে এক অভিনব সমন্বয় করিয়া সাংখ্যের এই অভাব পূরণ করিয়া দিয়াছে। পুরুষকে প্রকৃতি হইতে পৃথক করিতে হইবে—কিন্তু ইহাই সব নহে, ইহার পর পুরুষের চৈতন্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পুনরায় প্রকৃতিকে গ্রহণ করিতে হইবে—পুরুষের সহিত প্রকৃতির চির-বিচ্ছেদ কখনও হইতে পারে না, কারণ প্রকৃতি পুরুষ হইতে কোন স্বতন্ত্র সত্তা নহে, প্রকৃতি পুরুষেরই শক্তি। যাহা বর্জন করিতে হইবে তাহা হইতেছে প্রকৃতির নীচের রূপ ত্রিগুণময়ী ভাব—সেখানে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে প্রকৃতির উর্দ্ধতন রূপ পরা প্রকৃতি, ইহাই গীতার সমন্বয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন 'প্রথমে নেতি নেতি করতে হয়—তিনি পঞ্চভূত নন ইন্দ্রিয় নন, মন বুদ্ধি, অহঙ্কার নন। তিনি সকল তত্ত্বের অতীত। ছাদে উঠতে হবে—সব সিঁড়ি একে একে ত্যাগ করে যেতে হবে। 'নেতি' নেতি' করে বিচারের শেষে ব্রহ্মজ্ঞান। তার পর যা ত্যাগ করে গিছিল, তাই আবার গ্রহণ। ছাদে উঠবার সময় সাবধানে উঠতে হয়। তার পর দেখে যে ছাদও যে জিনিষ—ইট চূণ সুড়কি—সিঁড়িও সেই জিনিষে তৈয়ারী।"

ইহাই মূলতঃ গীতার বৈদান্তিক সমন্বয় —কিন্তু গীতা এইটি বিশদভাবে পরিস্ফুট করে নাই। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার বিখ্যাত Essays on the Gita গ্রন্থে গীতার এই সমন্বয়টি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু গীতাও অনেক দার্শনিক প্রশ্ন অমীমাংসিত রাখিয়াছে—ইঙ্গিতমাত্র দিয়া সাধক-গণকে নিজ নিজ জীবনে তাহা উপলব্ধি করিবার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছে। সেই সব প্রশ্নের পূর্ণ মীমাংসা আমরা দেখিতে পাই শ্রীঅরবিন্দের The Life Divine গ্রন্থে।

এ জগৎ, এ-সংসার মিথ্যা মায়া নহে, সৃষ্টি ও জগৎ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হউক, বিকশিত হউক এবং সেজন্য জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলেই কর্ম্ম করুক, কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ—উপনিষদের এই শিক্ষা গীতারও শিক্ষা। কিন্তু এই সৃষ্টিকার্য্যের দ্বারা ভগবানের কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে—মানুষকে কেন তিনি এই দুঃখতাপময় সংসারে আনিয়াছেন সে-সব অতি-প্রয়োজনীয় প্রশ্নের কোন উত্তর গীতা দেয় নাই। সংসারের দুঃখের যে কখনও অবসান হইতে পারে এমন আশাও আমরা গীতা হইতে পাই না। দুঃখময় সংসারের মধ্যে থাকিলেও কি করিলে দুঃখ মানুষকে স্পর্শ করিতে, বিচলিত করিতে পারিবে না গীতা সেই শিক্ষাই দিয়াছে—ইহার উপায় হইতেছে দেহাত্ম-জ্ঞান পরিত্যাগ করা—দেহ প্রাণ মন বুদ্ধির অতীত আত্মাকে জানা ও তাহার সহিত যুক্ত হওয়া। ইহা মূলতঃ সাংখ্য ও পাতঞ্জলের শিক্ষা—এবং ইহার মূল রহিয়াছে উপনিষদে—

অশরীরং বাব ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ। ছান্দোগ্য ৮।১২।১

"ইহা আমার শরীর এবং 'শরীরই আমি" এই অবিবেক হইতেছে সশরীরভাব বা দেহাভিমান। আত্মজ্ঞানের দ্বারা যাহার এই অবিবেক দূর হইয়াছে তাহাকে আর প্রিয় বা অপ্রিয়, সুখ বা দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "যতক্ষণ দেহবুদ্ধি ততক্ষণই সুখ দুঃখ জন্মমৃত্যু রোগশোক। দেহেরই এই সব, আত্মার নয়। আত্মজ্ঞান হলে সুখদুঃখ, জন্মমৃত্যু স্বপ্নবৎ বোধ হয়।" মুণ্ডকোপনিষদে আছে,,

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো-
হনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য
মহিমানমিতি বীতশোকঃ। —৩।১।২

জীব হইতেছে ভগবানের সহিত একই বৃক্ষে নিবাসী পক্ষী, ভোগসুখে মগ্ন হইয়া নিজ ভাগবত স্বরূপ ভুলিয়া আছে তাই শোক করিতেছে, মুহ্যমান হইতেছে। কিন্তু যখন সে ভগবানকে তাহার প্রিয়সখা বলিয়া দেখিতেছে তখন সে এই সবই তাঁহার মহিমা বলিয়া জানিতেছে এবং তাহার সব শোক দুঃখের চির-অবসান হইতেছে, বীতশোকঃ। (৫।২১ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

সংসারের সকল দুঃখশোক হইতে মুক্ত হইবার উপায় সম্বন্ধে কোন সন্দেহ বা মতভেদ নাই—অহংভাব বর্জন করিয়া আত্মাকেই আমাদের প্রকৃত সত্তা ও স্বরূপ বলিয়া জানিতে হইবে। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, ততঃ কিম্? তাহার পর কি? এক মত হইতেছে, এই দুঃখময় সংসার হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করা।

যতদিন দেহটা আছে ততদিন অগত্যা সংসাবে থাকা—কিন্তু সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে। ততদিন লোকেব উপকাব কবা যাইতে পাবে, কিন্তু সে উপকাবেব অর্থ সংসাবেব মজ্জাগত দুঃখ দূব কবিযা এই পৃথিবীতেই মানবজীবনেব উন্নতি সাধন কবা নহে, পবন্তু অন্য লোকেও যাহাতে আত্মজ্ঞান লাভ কবিযা দৈহিক জীবনের চিব-অবসান কবিতে পাবে সে-বিষযে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওযা, পথ দেখান। গত সহস্রাধিক বৎসব ধবিযা ভাবতে অধ্যাত্মসাধনা মূলতঃ এই মত, এই পন্থাবই অনুসবণ কবিযাছে।

আব একটি মত হইতেছে—সাংসাবিক জীবনকেই দুঃখ হইতে মুক্ত কবা। সাংখ্য ও পাতঞ্জল দেখাইযাছে, দুঃখমেব সর্ব্বম্, ত্রিগুণমযী প্রকৃতি যে সুখদুঃখময জীবনেব বিকাশ কবিযাছে ইহা বস্তুতঃ সর্ব্বতোভাবেই দুঃখময়—ত্রিগুণেব খেলাব মধ্যে থাকিযা কেহ দুঃখেব হাত এড়াইতে পাবে না বিশুদ্ধ শান্তি বা আনন্দ লাভ কবিতে পাবে না। প্রকৃতি যদি বাস্তবিকই চৈতন্যময পুরুষ হইতে ভিন্ন হয এবং ইহা ত্রিগুণমযী জড়স্বরূপ হয তাহা হইলে এই প্রকৃতিব সৃষ্ট জগৎ দুঃখময হইতে বাধ্য। কিন্তু এই সাংখ্যমত বেদান্তেব গ্রাহ্য নহে এবং বস্তুতঃ উপনিষদেব সত্যেব কেবল একটা দিকই ইহাতে গৃহীত হইযাছে। বেদান্তমতে প্রকৃতি হইতেছে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেবই শক্তি—আনন্দই তাহাব মূল স্বরূপ। উপনিষদ স্পষ্ট বলিযাছে এই জগৎ আনন্দ হইতে সৃষ্ট হইযাছে আনন্দেই বিধৃত বহিযাছে, আনন্দেব দিকেই ফিবিযা যাইতেছে।* ভগবান আনন্দময—তিনি দুঃখেব জন্য এ-জগৎ সৃষ্টি কবেন নাই—ভাগবত চৈতন্যে দুঃখেব স্থান নাই। ভগবানেব জগৎ-সৃষ্টিব যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে তবে তাহা আনন্দেবই নিত্য নূতন বিকাশ ছাড়া আর কিছুই হইতে পাবে না। দুঃখ সংসাবে আছে, অতি তীব্র মর্ম্মন্তুদ দুঃখ আছে—কিন্তু তাহা বৃথা নহে, তাহাব লক্ষ্য হইতেছে নিবতিশয আনন্দেব বিকাশ কবা—ঐ দুঃখই হইবে সেই নূতন আনন্দেব উপাদান স্বরূপ,

"সকল কাঁটা ধন্য হযে
ফুটবে গো ফুল ফুটবে।"

শ্রীবামকৃষ্ণ বলিযাছেন, "যেমন প্রসববেদনাব পব সন্তান-লাভ।" সংসাবেব যাবতীয শোকদুঃখেব ইহা অপেক্ষা সঙ্গত ব্যাখ্যা আর কিছুই হইতে পাবে না।

অতএব সংসার হইতে সবিয়া যাওয়া নহে, এই সাংসাবিক দুঃখময জীবনকে পবিবর্ত্তিত, সংশোধিত, রূপান্তরিত করিয়া দিব্য আনন্দময় জীবনে

---

* ৫।২২ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য—পৃ ৪৩৪

পরিণত করা—ইহাই ভগবানের মানব-সৃষ্টির প্রকৃত লক্ষ্য। ইহারই উপায় প্রথমে দেহ হইতে, প্রকৃতি হইতে পুরুষকে, আত্মাকে স্বতন্ত্র ও পৃথক করিয়া দেখিতে শিখিতে হইবে। কিন্তু একবার ইহা সম্পাদিত হইলে ঊর্দ্ধ্ব হইতে অধ্যাত্ম জ্যোতি ও শক্তি এই দেহের মধ্যেই অবতীর্ণ হইয়া এই দৈহিক জীবনের সমস্ত ত্রুটি ও অপূর্ণতা দূর করিয়া ইহাকে রূপান্তরিত করিতে পারে। তখন যে প্রকৃতিকে ছাড়িয়া গিয়াছিলাম তাহাকেই আবার নূতনভাবে গ্রহণ করা যায়।

কিন্তু ইহা সম্ভব হইতে পারে কেবল যদি এখন পুরুষের সহিত প্রকৃতির যে সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহার পরিবর্ত্তন সাধিত হয়—এখন প্রকৃতিই সব করিতেছে, পুরুষ শুধু দ্রষ্টা, প্রকৃতি অহং ও অবিদ্যার বিকাশ করিয়া পুরুষকে আবরিত করিতেছে, মানুষ আত্মজ্ঞানহারা হইয়া প্রকৃতির সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখিতেছে—সেখানে প্রকৃতির উপর পুরুষের কোন কর্তৃত্ব নাই। কিন্তু যোগ-সাধনার দ্বারা পুরুষকে প্রকৃতি হইতে পৃথক করিলে আমরা পুরুষের যে স্বরূপ দেখিতে পারি তাহাতে পুরুষ শুধুই দ্রষ্টা নহে, পুরুষ অনুমন্তা—পুরুষের অনুমতি ভিন্ন প্রকৃতি কিছুই করিতে পারে না। আরও গভীরে যাইলে আমরা দেখিতে পাই পুরুষ শুধুই দ্রষ্টা বা অনুমন্তা নহে—পুরুষই ঈশ্বর, প্রকৃতি তাঁহার অনুগতা। এইটিকেই গীতা পুরুষ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান বলিয়াছে

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ। ১৩।২২

সাংখ্য ও পাতঞ্জল পুরুষের শুধু উপদ্রষ্টা ভাবটিই দেখিয়াছে। আমরা যদি পুরুষের শুধু এই দ্রষ্টাভাবেই প্রতিষ্ঠিত হই তাহা হইলে প্রকৃতি নিজের ভাবেই চলিবে—তাহার গুণসকল পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিয়া সুখ দুঃখ মোহের সৃষ্টি করিতে থাকিবে। তখন এই প্রকৃতির সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করা ভিন্ন দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের আর কোন উপায়ই থাকিবে না—এবং ইহাই সাংখ্য পাতঞ্জলের মত। কিন্তু গভীরতর আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া আমরা যদি ঊর্দ্ধ্বের অধ্যাত্মশক্তিকে আহ্বান করিয়া নামাইয়া আনি তাহা হইলে এই প্রকৃতিরই সত্য রূপ প্রকট হইবে। এখন উহা জড়, ত্রিগুণাত্মিকা, mechanical—তাই এখানে সবই দুঃখ ও দ্বন্দ্বে পূর্ণ। কিন্তু ইহা হইতেছে প্রকৃতির বর্ত্তমান বাহ্যরূপ—মূল সত্তায় প্রকৃতি সচ্চিদানন্দময়ী, চেতনা ও আনন্দ ইহাতে অনুস্যূত রহিয়াছে—কিন্তু বর্ত্তমানে উহা লুক্কায়িত রহিয়াছে। ঊর্দ্ধ্বের অধ্যাত্ম জ্ঞান ও শক্তির অবতরণে এই গুপ্ত চৈতন্য ও আনন্দকে জাগাইয়া ফুটাইয়া তোলা যাইতে পারে—এবং তাহা হইলে এই পার্থিব মানবজীবন, এই দেহের জীবনই সকল দুঃখ হইতে চিরমুক্ত হইয়া আনন্দময়

হইবে। পুরুষ ও প্রকৃতির পার্থক্য উপলব্ধি করিয়া যাহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, দেহ, মন, বুদ্ধির অতীত আত্মার সন্ধান পাইয়াছেন তাঁহারাই অধ্যাত্ম-মানব, তাঁহাদের জীবনকেই অধ্যাত্ম জীবন বলা যাইতে পারে। তাঁহারা আত্মচৈতন্য ও আত্মানন্দের মধ্যে বাস করেন, তাঁহাদের জীবনের পূর্ণতার জন্য তাঁহারা বাহিরের কোন কিছুর অপেক্ষা রাখেন না। কিন্তু যিনি দিব্য মানব তিনি এই নূতন অধ্যাত্ম ভিত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া আরও অগ্রসর হন—তিনি আমাদের বর্ত্তমান বাহ্য অজ্ঞানের জীবনকে গ্রহণ করিয়া তাহাকে জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানের জীবনে পরিণত করেন। আমরা আমাদের অজ্ঞান জীবনে যে-সব জিনিষ লাভ করিতে চেষ্টা করি, সত্য চাই, শিব চাই, সৌন্দর্য্য চাই, প্রেম চাই, আনন্দ চাই—কিন্তু অজ্ঞান ও অক্ষমতার জন্য সে-সব লাভ করিতে পারি না—তিনি জ্ঞানের আলোকে সেই-সবকে সিদ্ধ করিয়া তোলেন। তখন সকল জ্ঞান হয় আত্ম-জ্ঞানের প্রকাশ, সকল কর্ম্ম হয় আত্মশক্তির প্রকাশ সকল আনন্দ হয় বিশ্বময় আত্মানন্দের প্রকাশ। তাঁহার জীবনকেই দিব্যজীবন বলা যায়। তাঁহার আর কোন আসক্তি বা বন্ধন থাকে না, কারণ প্রতি পদবিক্ষেপে, প্রত্যেক বস্তুতে তিনি সচ্চিদানন্দ আত্মাকেই উপলব্ধি করেন।

দিব্য জীবনের অর্থ দেহ, প্রাণ, মনের লোপ সাধন নহে তাহাদের পূর্ণতা সাধন—তাহার মধ্যে যেমন মন ও প্রাণের সিদ্ধি আছে তেমনই দেহেরও সিদ্ধি আছে। আমাদের মন চায় জ্ঞান, প্রাণ চায় কর্ম্ম, বিজয়, সৃষ্টি, প্রতিষ্ঠা, প্রেম, নিত্য নূতন ভোগ, দেহ চায় দৃঢ়তা, স্বাস্থ্য, যৌবন, সৌন্দর্য্য, তৃপ্তি। এ-সব চাওয়াতে কোন দোষই নাই—কারণ এ-সবই হইতেছে প্রকৃতির মধ্যে সচ্চিদানন্দের আত্মপ্রকাশের প্রয়াস। যদি আমাদের দেহ, প্রাণ, মনের অপূর্ণতা ও ত্রুটি দূর হয় তাহা হইলে এই সবই আত্মা হইতে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে প্রবাহিত হইবে। আর এই ত্রুটি দূর হওয়া কিছুই অসম্ভব নহে—কারণ উপনিষদের বাণী—এই দেহ ব্রহ্ম (অন্ন ব্রহ্ম), এই প্রাণ ব্রহ্ম, এই মন ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম হইতেছেন অনন্ত অসীম সচ্চিদানন্দ। এ-সবই হইতেছে এক সচ্চিদানন্দেরই বিচিত্র আত্মপ্রকাশ—এই প্রকাশকে পূর্ণ করিয়া তোলাই পার্থিব ক্রমবিবর্ত্তনের লক্ষ্য। গীতা এই দিব্য জীবনের আদর্শটি পরিস্ফুট করে নাই—কিন্তু ইহার জন্য যে দুইটি জিনিষ মূলতঃ প্রয়োজন তাহাদের উপরেই জোর দিয়াছে। প্রথমতঃ দেহ, প্রাণ, মনের অতীত আত্মাকে জানিতে হইবে, আত্মচৈতন্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ সেই প্রতিষ্ঠা হইতে নূতন ভাবে সাংসারিক জীবনকে গ্রহণ করিতে হইবে, সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম্ম করিতে হইবে। এই জীবন এখন দুঃখময় কিন্তু ইহাকে যে আনন্দময় করিয়া তোলা যায়—গীতা

তাহার ইঙ্গিত দিয়াছে, ভুঙ্ক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধম্। কিন্তু এই আদর্শকে পরিস্ফুট করিতে হইলে যে-সব দার্শনিক তত্ত্বের মীমাংসা করিতে হয় গীতায় তাহাদের আলোচনা নাই। সে-সবের সম্যক আলোচনা করিয়াছেন শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার The Life Divine গ্রন্থে।

সাংখ্য ও পাতঞ্জল বলিয়াছে, "এই সংসারের স্বরূপই দুঃখময়—দুঃখমের সর্ব্বম্, এখানে কেহ দুঃখ এড়াইতে পারে না।" আমরা বলি এটা শুধু সংসারের বাহ্য রূপ—সংসার আনন্দময় ভগবান হইতে উদ্ভূত অতএব ইহার স্বরূপ হইতেছে আনন্দময়, আনন্দমেব সর্ব্বম্, এখানে কেহ আনন্দ এড়াইতে পারে না। সব দুঃখ দ্বন্দ্ব হইতে এখনও মানুষ সৃষ্টির আনন্দ, সৃষ্টির মধুই আস্বাদন করিতেছে। সকল দুঃখের মধ্যেও মানুষ যদি ভিতরে ভিতরে আনন্দ না পাইত তাহা হইলে সে বাঁচিতে পারিত না, নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিত না। মানুষ যখন আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া বাহ্যজীবনকে রূপান্তরিত করিবে—তখন এই বাহ্য দুঃখও আর থাকিবে না। সব জীবন, সব কর্ম্মই হইবে পরম আনন্দময়। সেই দিব্য-রূপান্তরলাভের পূর্ব্বেও মানুষ সৃষ্টির মূলগত আনন্দকে নিবিড়ভাবেই আস্বাদন করিতে পারে।

সাধারণ লোকে এই দুঃখময় সংসারের মধ্যেও যে রস পায়, আনন্দ পায় তাহা স্বীকার করিয়া তাহার ব্যাখ্যাস্বরূপ পাতঞ্জল ভাষ্যে বলা হইয়াছে, "বিদ্বান (মুমুক্ষু যোগী) চক্ষুর তারা সদৃশ, সামান্য কারণেই অশান্তি বোধ করেন, যেমন মাকড়সার সূত্র চক্ষুতে পতিত হইয়া স্পর্শ দ্বারা চক্ষুর পীড়াদায়ক হয়, শরীরের হস্ত পদ আদি অবয়বে পড়িলে কিছুই হয় না, তদ্রূপ সংসারের সকল ভোগসুখের মধ্যে যে দুঃখ সূক্ষ্মভাবে জড়িত রহিয়াছে তাহা চক্ষুতারা সদৃশ কোমল স্বভাব যোগীকেই পীড়ন করে। সাধারণ লোকের উহাতে কষ্টবোধ হয় না, তাহারা স্বকৃত কর্ম্মফল দুঃখ ভোগ করিযা করিয়া ত্যাগ করে, ত্যাগ করিয়া করিয়া পুনর্ব্বার গ্রহণ করে, অনাদি সংস্কার দ্বারা বিচিত্র চিত্তভূমিতে অবস্থিত অবিদ্যা-সহকারে ত্যাগের যোগ্য পুত্রকলত্রাদি বিষয়ে অহঙ্কার মমকার (আমার আমার বোধ) করিয়া বাহ্য ও আধ্যাত্মিক উপায় সাধ্য আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখ দ্বারা অভিভূত হয়। উহারা অবিদ্যা দ্বারা সর্ব্বদা অভিভূত থাকিয়া বারবার জন্মগ্রহণ করে। এইরূপে আপনাকে ও অন্য-সাধারণকে অনাদি দুঃখস্রোতে ভাসমান দেখিয়া যোগিগণ সমস্ত দুঃখের ক্ষয়-কারণ সম্যক দর্শন অর্থাৎ আত্মজ্ঞানকে রক্ষক বলিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন।"

উল্লিখিত ব্যাখ্যা হইতে দেখা যাইবে যে সংসারের সকল দুঃখের মূল হইতেছে রাগ, দ্বেষ, অহংভাব এবং এ-সবই অজ্ঞান হইতে প্রসূত। আত্মজ্ঞানে

প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাংসারিক জীবনকে গ্রহণ করিলে কোন দুঃখই আর যোগীকে স্পর্শ করিতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন উঠিবে, যোগী রাগ দ্বেষ হইতে মুক্ত হইয়া মানসিক দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন—কিন্তু যতদিন দেহ থাকিবে ততদিন জরা ব্যাধি আকস্মিক দুর্ঘটনা প্রভৃতি দুঃখ অনিবার্য্য—যোগী আত্মায় বা মনে দুঃখশূন্য হইয়া থাকিলেও তাহার দেহ ও প্রাণ ত কষ্টভোগ করিবে—অতএব যতক্ষণ দেহ আছে ততক্ষণ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইতে পারে না—অতএব যাহাতে পুরুষকে আর দেহে জন্ম গ্রহণ করিতে না হয় তাহাই দুঃখ নিবৃত্তির চরম উপায়। দেহধারী মানবের পক্ষে দুঃখলেশশূন্য আনন্দময় দিব্য-জীবনলাভ কখনই সম্ভব নহে।

এই আপত্তির উত্তর দিতে হইলে দুঃখের মূল স্বরূপ কি তাহা বুঝিতে হইবে। দেহ, প্রাণ, মন—এই তিন লইয়াই আমাদের প্রাকৃত সত্তা গঠিত। কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনে এই তিনটির মধ্যে বিরোধ ও দ্বন্দ্ব লাগিয়াই আছে। প্রাণ ভোগ সুখ চায়, মনবুদ্ধি বলে ঐরূপ ভোগ ন্যায্য নহে, দেহ বলে "আমাকে বেশী চালিত করো না, আমাকে শান্তিতে চুপচাপ থাকিতে দাও।" আমাদের সত্তার বিভিন্ন অংশ আমাদিগকে বিভিন্ন দিকে টানিতেছে, তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য নাই—তাহাদের উপর আমাদের সম্যক আধিপত্য নাই—ইহাই সকল দুঃখের মূল—

দেহের মধ্যে ছ'জন রিপু—
সদা আমায় দেয় যন্ত্রণা—
(আমার) মনকে বলি ভজ কালী
তারা কেউ কথা শোনে না।

ইহাকেই যোগসূত্রে বলা হইয়াছে "গুণবৃত্তিবিরোধ" (২।১৫), যন্ত্রবৎ গুণ-সকল পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতেছে অভিভূত করিতেছে। কিন্তু ইহা চলিতেছে কেবল এই জন্য যে প্রকৃতির গুণ-সকলের উপর কর্তৃত্ব করিবার কেহ নাই—পুরুষ জাগ্রত হইয়া যখন কর্তৃত্ব গ্রহণ করে, নিজ "ঈশ্বর" ভাব প্রকট করে—তখন সমগ্র সত্তায় শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়, বিরোধের ও দুঃখের অবসান হয়। আমাদের দেহ, প্রাণ, মনে যে চৈতন্য রহিয়াছে ইহা এখনও অসম্পূর্ণ ও দুর্ব্বল—এই জন্য ইহারা বাহ্য স্পর্শ-সকল ইচ্ছামত গ্রহণ বা বর্জন করিতে পারে না, গ্রহণ করিয়াও সে সকলকে আয়ত্ত করিতে পারে না, ঠিক মত ব্যবহার করিতে পারে না। ঐ সকল স্পর্শ আসিতেছে বিশ্বশক্তি হইতে, সে-শক্তি ভগবানেরই অনন্ত শক্তি—সে-শক্তির স্পর্শ বা আলিঙ্গন গ্রহণ করিবার মত, অনন্তকে বুকে ধরিবার মত সামর্থ্য আমাদের দেহ প্রাণ, মনে নাই—তাই আমরা দুঃখ পাই,

বেদনা পাই। আমাদেব সকল দুঃখ বেদনাই হইতেছে মূলতঃ ভগবানেব আলিঙ্গন,

"তুমি যে আছ বক্ষে ধবে
বেদনা তাহা জানাক্ মোবে"

কিন্তু প্রেমময আনন্দময ভগবান আমাদিগকে বুকে চাপিযা ধবিলে আমবা কেন বেদনা পাই? ইহাব কাবণ যে-চৈতন্য ও শক্তি থাকিলে আমবা প্রেমময়েব এই নিবিড আলিঙ্গন গ্রহণ কবিতে পাবি এখনও আমাদেব মধ্যে তাহাব বিকাশ হয নাই। জডেব মধ্যে দুঃখ নাই, বেদনা নাই। এমন কি যে-সব মানুষ অসভ্য, অসংস্কৃত তাহাদেব মধ্যেও বেদনা-বোধ কম সভ্য শিক্ষিত মানুষেব মধ্যেই সূক্ষ্ম সুখ-দুঃখ বোধ জাগিযাছে, চৈতন্য বিকশিত হইযাছে—কিন্তু তদনুযাযী শক্তিব বিকাশ হয নাই। মানুষ ইচ্ছাশক্তিব প্রযোগ কবিযা অনেক ব্যথা ও বেদনা অবিচলিতভাবে সহ্য কবিতে পাবে। যোগসাধনাব দ্বাবা এই শক্তি সাতিশয বর্দ্ধিত কবা যায—সংসাবেব সকল ঘাত প্রতিঘাত শান্তভাবে গ্রহণ কবিবাব সামর্থ্য জন্মে, শুধু মন নহে প্রাণ এবং দেহ পর্য্যন্ত অধ্যাত্মপ্রভাবে শান্তপ্রতিষ্ঠ হইযা উঠে—তাই দেখা যায তীব্র বিষপানেও যোগীদেব দেহে কোন ক্ষতিই হয না। এমন কি তাঁহাবা বিষ হইতেই অমৃতেব আস্বাদ লাভ কবিতে পাবেন, তীব্র যন্ত্রণাকেই তীব্র আনন্দে পবিণত কবিতে পাবেন। সাধাবণ জীবনেই দেখা যায একজন দুর্ব্বল ব্যক্তি যে আঘাতে ব্যথা পায, আব একজন সবল ব্যক্তি তাহাতেই আনন্দ পায—যোগসাধনাব দ্বাবা এই শক্তি যথেষ্ট বর্দ্ধিত কবা যায। ইহাই হইতেছে দুঃখজযেব প্রকৃত পন্থা। অবশ্য মানবশবীবেব ব্যথাসহনশক্তিব সীমা আছে। যোগীব দেহেব উপব যদি বজ্রাঘাত হয অথবা একটা প্রকাণ্ড বোমা পতিত হয—সে দেহ নিশ্চযই ধ্বংস হইবে কিন্তু ঐরূপ আঘাতকে সবাইযা দিযা দেহটাকে বক্ষা কবিবাব সামর্থ্য যোগী লাভ কবেন। বজ্রাঘাত আসিতেছে তাহা তিনি পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পাবেন অথবা তাহাকে এমন ভাবে সবাইয়া দিতে পাবেন যে উহা তাঁহাব দেহেব উপব না পডিযা নিকটবর্ত্তী অন্য কোন স্থানে পডিবে, তাঁহাব দেহটি বক্ষা পাইবে। দেহটাকে এমন ভাবে উদ্বুদ্ধ কবা যায যে ইহাব প্রতি কোষে নিবতিশয অধ্যাত্ম আনন্দ প্রবাহিত হয—সেই আনন্দেব স্রোতেই দেহটাব রূপান্তব সাধিত হইবে, এই মানবদেহও জবা, ব্যাধি ও মৃত্যু হইতে মুক্তিলাভ কবিবে।

আনন্দেব আকাঙ্ক্ষা মানুষেব মজ্জাগত এবং ইহা সত্যেব উপবেই প্রতিষ্ঠিত কারণ আনন্দ হইতেছে ব্রহ্মের অন্তরতম স্বরূপ। আত্মচৈতন্যে, ব্রহ্ম-

চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে মানুষ তাহার নিজের মধ্যে সর্ব্বদা গভীর আনন্দ অনুভব করিবে,

সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ।৬।২৮

অধ্যাত্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত দিব্যজীবন সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন,

"In the gnostic consciousness at any stage there would be always in some degree this fundamental and spiritual conscious delight of existence in the whole depth of the being; but also all the movements of Nature would be pervaded by it, and all the actions and reactions of the life and the body none could escape the law of the Ananda. Even before the gnostic change there can be a beginning of this fundamental ecstasy of being translated into a manifold beauty and delight. In the mind, it translates into a calm of intense delight of spiritual perception and vision and knowledge, in the heart into a wide or deep or passionate delight of universal union and love and sympathy and the joy of beings and the joy of things. In the will and vital parts it is felt as the energy of delight of a divine life-power in action or a beatitude of the senses perceiving and meeting the one everywhere, perceiving as their normal æsthesis of things a universal beauty and a secret harmony of creation of which our mind can catch only imperfect glimpses or a rare supernormal sense: In the body it reveals itself as an ecstasy pouring into it from the heights of the spirit and the peace and bliss of a pure and spiritualised physical existence. A universal beauty and glory of being begins to manifest; all objects reveal hidden lines, vibrations, powers, harmonic significances concealed from the normal mind and the physical sense. In the universal phenomenon is

revealed the eternal Ananda." (The Life Divine, Vol II pp 1065-66)

অর্থাৎ অতিমানস বিজ্ঞানময় চৈতন্যের যে-কোন স্তরে প্রতিষ্ঠিত হইলে কতক পরিমাণে এই মূলগত অধ্যাত্ম আনন্দ সত্তার সমগ্র গভীর অংশকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকিবে ; শুধু তাহাই নহে, প্রকৃতির সকল গতিভঙ্গীতে, দেহ ও প্রাণের সকল ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ায় সেই আনন্দ ব্যাপ্ত হইয়া থাকিবে। এমন কি এই অতি-মানস রূপান্তর সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে হইতেই এই মূলগত আনন্দ আস্বাদন আরম্ভ হইতে পারে, তাহা প্রকট হয় বিচিত্র সৌন্দর্য্য ও সুখবোধে। মনের মধ্যে তাহা প্রকট হয় অধ্যাত্ম দৃষ্টি ও জ্ঞানের শান্ত গভীর আনন্দ রূপে, হৃদয়ের মধ্যে তাহা প্রকট হয়—সকলের সহিত যোগ, প্রেম, সহানুভূতির উদার বা গভীর বা আবেগ-ময় উল্লাসরূপে, সকল প্রাণী, সকল বস্তুতে আনন্দ উপভোগে।* ইচ্ছাশক্তি ও প্রাণের মধ্যে তাহা অনুভূত হয় দিব্য কর্ম্মের আনন্দে অথবা ইন্দ্রিয়গণের সর্ব্বত্র সেই এক ভগবানের স্পর্শসুখলাভের আনন্দে, সর্ব্বত্র এমন এক সৌন্দর্য্য ও নিগূঢ় সুসঙ্গতির অনুভূতিতে যাহার ক্ষীণ আভাস মাত্র মনের অধিগম্য। দেহের মধ্যে তাহা প্রকট হয় ঊর্দ্ধ্ব হইতে অধ্যাত্ম আনন্দের প্রবাহে এবং শুদ্ধ ও অধ্যাত্ম-ভাবাপন্ন দৈহিক জীবনের শান্তি ও সুখানুভূতিতে। সর্ব্বত্র এক অভিনব সৌন্দর্য্য ও মহিমা প্রকট হইতে আরম্ভ হয়, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে এমন সব রেখা, স্পন্দন, শক্তি, সুসঙ্গতি প্রকাশিত হয় যে-সব সাধারণ মন এবং স্থূল ইন্দ্রি-য়ের অগোচর। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সচ্চিদানন্দের শাশ্বত আনন্দ প্রকটিত হয়।

যোগসংজ্ঞিতম্। গীতা এখানে "বিয়োগ"কে যোগ বলিয়াছে—বলিয়াছে দুঃখ-সংযোগের বিয়োগই "যোগ" বলিয়া কথিত হয়। "বিয়োগ"কে কেন

---

* এই আনন্দ-আস্বাদনের জন্যই কবির আকুতি,

যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে
মুক্ত কর হে বন্ধ

*   *

নন্দিত কর নন্দিত কর
নন্দিত কর হে।

অথবা

বাতাস জল আকাশ আলো
সবারে কবে বাসিব ভালো,
হৃদয় সভা জুড়িয়া তারা
বসিবে নানা সাজে।

"যোগ" বলা হয়। শঙ্করাদি ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়াছেন বিপরীতলক্ষণেন বিদ্যাৎ, যোগ এই শব্দটির মুখ্য অর্থ সংযোগ বা মিলন এখানে কিন্তু বিপরীত অর্থ বুঝাইতে অর্থাৎ "বিয়োগ" বুঝাইতেই যোগ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা সাধক অভিমানভরে গাহিতেছেন

"বড় আশা করেছিলাম
শ্যামা আমার করবি ভাল।
যে ভাল করিলি শ্যামা
একে একে জ্ঞানা গেল।'

এখানে তৃতীয় পদে "মন্দ" বুঝাইতেই 'ভাল শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু গীতা এখানে শুধু একটা বাক্‌চাতুরী করিবার জন্য 'বিয়োগ" ও "যোগ" একত্র ব্যবহার করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। গীতার মতে যোগ হইতেছে মিলন, মানবের সহিত ভগবানের সজ্ঞানে সংযোগ। গীতার মতে ইহাকেই "যোগ" বলা ঠিক হয়। কিন্তু পাতঞ্জল চিত্তবৃত্তিনিরোধকেই যোগ বলিয়াছে, তাহার দ্বারা পুরুষ ও প্রকৃতির চিরবিচ্ছেদ হয়, অতএব তাহাকে যোগ বলা সঙ্গত হয় না—ইহাই ইঙ্গিত করিবার জন্য গীতা এখানে বিয়োগ" এবং "যোগ" শব্দ দুইটি পাশাপাশি রাখিয়া পাতঞ্জলের ত্রুটি বা অপূর্ণতার দিকেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গেই লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, পাতঞ্জল "বিয়োগ" শব্দটি ব্যবহার করে নাই, "অভাব" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছে, তদভাবে সংযোগাভাবঃ (২।২৫),—অবিদ্যার অভাব বা নাশ হইলে সংযোগের নাশ হয়। আর সংযোগ শব্দেও পাতঞ্জল মিলন বা যুক্ত হওয়া বুঝে নাই, ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। দ্রষ্টা থাকিলেই দৃশ্য থাকে, দৃশ্য না থাকিলে দ্রষ্টা থাকে না—দুইটিই পরস্পর সাপেক্ষ, পুরুষ প্রকৃতির দ্রষ্টা, প্রকৃতি পুরুষের দর্শনযোগ্য—এই সম্বন্ধটি বুঝাইতেই পাতঞ্জল "সংযোগ" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছে। অতএব সংযোগ হইতেছে এখানে একটি ভ্রান্তজ্ঞান—তাহার নাশকে "যোগ" বলিয়া অভিহিত করিলে কোনই বিরোধ হয় না।

যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা। যোগ সাধনার দ্বারা যে মহান ফল লাভ করা যায় তাহা দেখাইয়া গীতা বলিতেছে যে, সুদৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত যোগ সাধনা করিতে হইবে। যত বাধা বিপত্তি আসুক, যতই কঠিন বলিয়া বোধ হউক, কিছুতেই নিরুৎসাহ হওয়া চলিবে না, বার বার অকৃতকার্য্য হইলেও লাগিয়া থাকিতে হইবে যতক্ষণ না চরম মুক্তিলাভ করা যায়, নির্ব্বাণের পরম শান্তি অনন্তকালের জন্য অধিগত হয়।

গীতা-প্রচার সমিতির নিয়মাবলী

শ্রীঅরবিন্দ গীতার যে অমৃতময়ী ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহার বহুল প্রচারই গীতা-প্রচার সমিতির উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য স্বীকার করিয়া বার্ষিক একটি টাকা চাঁদা দিলেই যে-কোন ব্যক্তি এই সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন।* কোন স্থানে অন্ততঃ পাঁচজন লোক সভ্য হইলে তাঁহারাই একটি শাখা সমিতি গঠন করিয়া গীতাপাঠমন্দির স্থাপনে উদ্যোগী হইবেন এবং কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ দিবেন। ঐ মন্দিরে সর্ব্বসাধারণের পাঠের জন্য গীতার শ্রীঅরবিন্দকৃত ব্যাখ্যামূলক পুস্তকসকল রক্ষিত হইবে এবং পবিত্র শান্তিময় আবেষ্টনের মধ্যে নীরব ধ্যানেরও ব্যবস্থা থাকিবে।

গীতা-প্রচার সমিতির প্রত্যেক সভ্য নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করিবেন :—

১। তিনি নিয়মিতভাবে গীতা পাঠ করিবেন, প্রত্যহ পত্র, পুষ্প যাহাই হউক কিছু ভক্তিভরে ভগবানকে অর্পণ করিবেন এবং কিছুক্ষণ ধ্যান করিবেন।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ৯।২৬

২। তিনি কদাচ কাহারও সহিত কলহ করিবেন না।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ ১২।১৫

৩। তিনি কদাচ কাম, ক্রোধ ও লোভকে প্রশ্রয় দিবেন না, অর্থাৎ ইহাদের বেগ উপস্থিত হইলেও তাহার বশে কোন কাজ করিবেন না, বুদ্ধির দ্বারা ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ॥ ১৬।২১

৪। তিনি প্রত্যহ নিয়মিতভাবে শারীরিক ব্যায়াম চর্চ্চা ও খেলা করিবেন।

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥ ৬।১৭

৫। তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বভূতের হিত কামনা করিবেন এবং ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞ হিসাবে যথাসাধ্য সর্ব্বভূতের সেবা করিবেন।

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥ ১২।৪

কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়
১০৩ ডি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
শ্যামবাজার, কলিকাতা ৪

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
সম্পাদক, গীতা-প্রচার সমিতি

---

* মুসলমান খ্রীষ্টান ও অন্যান্য ধর্ম্মের লোক এই সমিতির সভ্য হইলে তাঁহারা হিন্দু বলিয়াই গণ্য হইবেন।